জীবনের গল্প

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি চন্দ্রিমা মণ্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
বি-৬/১৭৫, কল্যাণী
নদীয়া

ব্যবস্থাপক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

পরিবেশক :
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : রতন মুখার্জী

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

১ মুক্তির স্বাদ

গ্রামের প্রান্তে বাউলের এক আখড়া, ছোট ছিটেবেড়ার ঘর, সামনে খানিকটা জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, একপাশে তুলসী মঞ্চ। সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে টিমটিম্ করে একটা প্রদীপ জ্বলছে, আর অনুচ্চ স্বরে ভেসে আসছে একটা গানের কলি—'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।' সঙ্গে টুংটুং করে বাজছে হাতের একতারা। আখড়ার মালিক হরিদাস বাউল। বয়স প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই, মাথায় লম্বা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, মুখে একমুখ পাকা দাড়ি, পরণে আলখাল্লা। চোখ বন্ধ করে আপন মনে গান গাইছে আর গাল বেয়ে নামছে জলের ধারা।

ক'দিন ধরে হরিদাস আখড়ায় একাই আছে, তার নতুন বোষ্টমী কয়েক দিন থেকেই অনুপস্থিত। সময় কাটতে চায় না, বয়সের ভারে চলাফেরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত।

হরিদাসের বাবা রামদাস এই আখড়া স্থাপন করে যান, তার দেহ রক্ষার পর হরিদাস এই আখড়ার মালিক। রামদাস এই এলাকার একজন নামকরা বাউল শিল্পী ছিলেন। কণ্ঠে যেন তার যাদু ছিল, তার গান একবার শুনলে আর ভোলা যেত না। আশেপাশের গ্রাম থেকে তার ডাক আসত বিভিন্ন পাল-পার্বণে গান গাওয়ার জন্য। বাবার সঙ্গে ছোট হরিদাসও যেত বিভিন্ন জায়গায়। হরিদাসও ছিল তার বাবার সার্থক উত্তরসূরী। ছোটবেলা থেকেই তার কণ্ঠমাধুর্য্য সকলকে আকৃষ্ট করত। রামদাস দেহ রাখার পর হরিদাস তার বাবার বাউল গানের ধারাটি নিখুঁত ভাবে ধরে রাখে এবং ক্রমে ক্রমে তার গান রামদাসের গানের চেয়েও আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তখনকার দিনে গানের প্রচারের এত ব্যবস্থা ছিল না, ব্যবস্থা ছিল না সহজে গান রেকর্ড বা ক্যাসেট করার। আর এখনকার মত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাউল গানের জলসারও এত রমরমা ছিল না। সুতরাং বাউল মানেই ভিক্ষাজীবি, এটাই ছিল নিয়ম। গান শুনিয়ে ভিক্ষা করেই তাদের দিনাতিপাত হত। তবে তাদের নিজেকে মেলে ধরার সবচেয়ে বড় দুটি জায়গা ছিল বৈরাগীতলা ও জয়দেবের বাউল মেলা। সারা রাজ্যের বাউলরা মেলায় জড়ো হয়ে গানে গানে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে রাখে, সারা বছর পর একসঙ্গে

মিলিত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। সব বাউলরা সারা বছর ঐ দুটি মেলার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে।

হরিদাস বাউল বসে বসে পুরানো দিনের কথা ভাবে। তার সুরেলা কণ্ঠের জন্য বাউল সমাজে এক বিশিষ্ট আসন আদায় করে নিয়েছিল। নবীন শিল্পীরা তার কাছে এসে নাড়া বাঁধত। সব সময় জমজমাট থাকত হরিদাসের আখড়া। বৈরাগীতলার মেলায় কণ্ঠীবদল করে হরিমতীকে নিয়ে আসে আখড়ায়। হরিমতীরও ছিল সুরেলা কণ্ঠ, তাই দুজনে যখন ভিক্ষায় বার হত তাদের গানের সুরে পথঘাট মুখরিত হয়ে উঠত। হরিদাসের হাতে একতারা, কাঁধে ঝোলানো ছোট বাঁয়া তবলা আর হরিমতীর হাতে খঞ্জনি। গৃহস্থেরা আদর করে তাদের বসতে দিত, একটার পর একটা গানের অনুরোধ আসত। কোন বিরক্তি প্রকাশ না করে তারাও মনপ্রাণ উজাড় করে গানে গানে ভরিয়ে দিত। গৃহস্থও অবশ্য তাদের ঝুলি ভর্তি করে দিত মনের আনন্দে। তাই তাদের আশ্রমে অন্নের অভাব কোন দিনই হত না। আর একটা গ্রাম ঘুরলেই তাদের প্রয়োজন মিটে যেত। ভিক্ষা সেরে হরিমতী রান্নার জোগাড় করত, হরিদাস গুপিযন্তর নিয়ে মেতে উঠত গানে। আখড়ায় অতিথি কেউ না কেউ থাকতই, তারা আসত গান শোনার টানে, গান শেখার তাগিদে। সদানন্দময় হরিদাসের এতে কোন বিরক্তি ছিল না। অতিথি সৎকারের সাথে সাথে গানবাজনাও চলত মনের আনন্দে। এমনি ভাবে বেশ আনন্দেই কাটছিল হরিদাসের আখড়ার জীবন। বছরে দু'বার দুটি মেলায় যাওয়া আর বাকি সময় আশ্রমেই দিনাতিপাত।

দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল। হরিদাস হরিমতীর বয়স বাড়তে থাকে। হরিদাসের চুল দাড়িতে পাক ধরতে শুরু করে। বয়সের ভার অবশ্য কাবু করতে পারে নাই এই নিঃসন্তান দম্পতিকে। আর তারা মনের আনন্দেই ঘুরে বেড়াত এ গ্রাম সে গ্রাম করে।

বছর দু'য়েক আগে জয়দেবের বাউল মেলা থেকে ফিরে হরিমতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হল না, হরিমতী দেহ রাখল। চোখের জল মুছে হরিদাস আখড়ার প্রাঙ্গণেই তাকে সমাহিত করল তার বাবা ও মায়ের সমাধির পাশেই। এখন থেকে হরিদাস একা, মনে শান্তি নাই, অতিথি সৎকারও ঠিক মত করতে পারে না। বুকের ভিতর থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বেড়িয়ে আসে, একতারাটি তুলে নিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে গান ধরে—"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়—"

কিন্তু তার গানে আগের মত সুর খেলে না, গান গেয়ে মনও ভরে না, উদগত অশ্রু সম্বরন করে চুপচাপ বসে থাকে হরিদাস।

হরিদাসের আখড়াটি ছিল আমোদপুর-কাটোয়া ছোট রেল লাইনের পাশে একটি গ্রামে। ক'দিন ধরে অবিশ্রাম বর্ষণ চলছে, সারাদিন সারারাত বিরাম নাই। একটু রাত হয়েছে, হরিদাস তার কুটিরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছে। একটি প্রদীপ জ্বলছে টিম্‌টিম্ করে। দরজায় যেন কিসের শব্দ হল? কানখাড়া করে শোনার চেষ্টা করে হরিদাস। আবার শব্দ হয়—ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্। হরিদাস 'কে ওখানে' বলে উঠে দরজা খোলে, অবাক হয়ে দেখল একটি যুবতী মেয়ে, পরণে শতচ্ছিন্ন মলিন বসন, সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপে, দরজার একপাশে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিদাসের মায়া হল, আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে প্রশ্ন করে—'কে গো তুমি, এই রাত্রিবেলায় কোথা থেকে আসছ?'

মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে কোন মতে বলে—'আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে আজ রাতের মত একটু আশ্রয় দিন।'

হরিদাস একটু ইতস্ততঃ করে বলে—'আশ্রয় তো দিতে পারি, কিন্তু আমার একটি মাত্র ঘর, আর এখানে কোন মেয়েছেলেও নাই, একটু তো অসুবিধা হবে।'

কাতর কণ্ঠে মেয়েটি বলে—'কোন অসুবিধা হবে না, আমি একপাশে রাতটুকু শুধু পড়ে থাকব, সকাল হলেই চলে যাব।'

অগত্যা মেয়েটিকে বাড়িতে স্থান দিতে হয় হরিদাসকে। হরিমতীর একটি পুরানো শুকনো কাপড় দেয় মেয়েটিকে। কাপড় পাল্টে এসে দেখল, হরিদাস একটি থালায় কিছু খাবার ঠিক করে রেখেছে মেয়েটির জন্য। সারাদিন অভুক্ত থেকে মেয়েটির ক্ষুধাবোধ লোপ পেয়েছিল, কিন্তু সামনে খাবার দেখে আর থাকতে পারল না। হরিদাস কিছু বলার আগেই খাবার নিয়ে বাইরে গেল এবং খাবার পর ঘরের এককোণে বসে থাকল। ঘরে মাদুর চাটাই বাড়তি থাকত, হরিদাসের নির্দেশে তারই একটি নিয়ে মেয়েটি শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সকাল হলে মেয়েটি যাবার জন্য তৈরী হয়। হরিদাস শুধায়—'তা এখন কোথায় যাওয়া হবে মেয়ের?'

—কোথায় আর যাব, যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, তারপর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে—বিষণ্ণ কণ্ঠে মেয়েটি বলে।

—তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ নাই? কোথাও কি তোমার জায়গা নাই—উৎকণ্ঠিত হয়ে হরিদাস জিজ্ঞাসা করে।

—ছিল, একদিন সবাই ছিল, বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন, কিন্তু এখন কেউ নাই।

—একটু খুলে বল দিকি সবকিছু, আমার যেন কেমন খট্‌কা লাগছে—হরিদাস বলে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে শুরু করে মেয়েটি। তার নাম কুসুম। বাবা মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান। বাড়ি ছিল হুগলি জেলার শিবপুর গ্রামে, কয়েক বিঘা জমি, একটি মাটির ঘর, এই ছিল সম্পত্তি। ওতেই কোন রকমে চলে যেত ওদের তিনজনের সংসার। ছোটবেলায় গ্রামেরই প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করে, লেখাপড়ায় নেহাৎ খারাপ ছিল না। এছাড়া যেটা ছিল তা তার গানের গলা। ছোটবেলা থেকেই গানের উপর খুব ঝোঁক ছিল, যে কোন গান একবার শুনেই তা গলায় তুলে নিতে পারত। এ নিয়ে তার মা-বাবারও গর্বের অন্ত ছিল না। গ্রামেরই প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করে আর পড়তে পারে নাই। তখন থেকে বাড়িতেই থাকত। দেখতে দেখতে বয়স হল প্রায় পনের-ষোলো বছর। বাবা-মা তার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার বিয়ের আগেই তার বাবা ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়। কুসুম ও তার মা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। চাষবাসের কাজও ঠিকমত হয় না, আর্থিক অনটন চরমে উঠে। যেটুকু জমি ছিল তার কিছু বিক্রি করে বাকিটা তার কাকার কাছে বন্ধক রাখা হল। বিনিময়ে কিছু ফসল পেত তারা। কিছু দিন চলার পর তার কাকা অন্যায় ভাবে বিধবার শেষ সম্বল জমিটুকু আত্মসাৎ করে নেয়। একমাত্র বসত ভিটেটুকু ছাড়া আর কিছু রইল না তাদের। অভাবে, শোকে, দুঃখে তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিছুদিন বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে মারা যায়। কুসুমের বয়স তখন কুড়ি পেরিয়েছে। এমতাবস্থায় নিজের মানসম্ভ্রম বাঁচাতে এক কাপড়ে গিয়ে হাজির হ'ল তার মামার কাছে। এছাড়া কুসুমের আর কোন উপায় ছিল না।

মামা নিমরাজি হলেও মামী ছিল খড়্গহস্ত তার ওখানে থাকার ব্যাপারে। মামী খ্যানখ্যানে গলায় বলে—'ও মাগো, এই সোমত্ত মেয়ে, কে ওর দায়িত্ব নেবে? একে আমার অভাবের সংসার তাতে আরও একটা পেট বাড়বে, কি হবে গো আমার।'

মামীতো তাকে ধুলোপায়েই বিদায় করে দিতে চেয়েছিল। মামা কোন রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করে।

—'তা, ও মেয়ে কি যেন নাম? কুসুম, শোন বাছা, এখানে থাকতে হলে গতর খাটিয়ে খেতে হবে। বসে বসে খাওয়ার ক্ষ্যামতা আমাদের নাই।'

কুসুম মাথা নেড়ে সায় দেয়। তখন থেকেই শুরু হল তার জীবন যন্ত্রণা। বাবা-মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান, কোন কাজকর্ম ভাল ভাবে শেখা নাই কিন্তু মামার সংসারে এসে একাধারে কাজের ঝি ও রাঁধুনি। আস্তে আস্তে মামী নিজের কাজকর্ম একেবারেই কমিয়ে দিল এবং মামীর অসুস্থতার অজুহাতে সারাদিন কুসুমের নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত থাকত না। কুসুম আসার পর থেকেই তার মামীর বাতের ব্যাথা বাড়ল, ঝি জবাব হল, আর তার পুরো দায় সামলাতে হত কুসুমকে। এত করেও সে মামীর মন পায় নাই, কথায় কথায় খোঁটা, নানা মন্তব্য। মুখ বুজে সব সহ্য করত কুসুম। সবার খাবার পর যেটুকু থাকত তাই দিয়ে কোন রকমে পেট ভরাত। মামীর পুরানো শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া সেলাই করে পড়তে হত। নূতন শাড়ি পড়ার কথা ভুলেই গেছিল কুসুম। দিনরাম অমানুষিক পরিশ্রম, রাত্রে শোবার আগেও তার রেহাই নেই, মামা-মামীর পায়ে ঘণ্টাখানেক ধরে তেল না মাখালে তাদের ঘুম আসত না। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসত না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করত। অনেক কষ্টে কান্না চেপে কখন ঘুমিয়ে পড়ত। এমনি ভাবেই মামার বাড়িতে কাটল তিন-চার বছর।

কুসুমের মামা ছিল লোভী প্রকৃতির। নানা রকম কাজের দালালি করে ভাইল রোজগার করত। অর্থোপার্জনের জন্য সে যে কোন কাজ করতে পিছপা হ'ত না। কিছুদিন থেকে একটা নূতন চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। একদিন কথায় কথায় তার স্ত্রীকে বলল—কুসুম তো বড় হয়েছে, আইবুড়ো মেয়ে তো চিরকাল বাড়িতে রাখা যায় না, তাই ওর তো বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

তার স্ত্রী বিয়ের কথা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল—'বিয়ে, ঐ মেয়ের বিয়ে, জান একটা মেয়ের বিয়ে দিতে কত খরচ, কে করবে ঐ খরচ। দরদ উথলে পড়ছে। মেয়ের বিয়ে দেবেন উনি।'

কুসুমের মামী জানত যে খরচ করে বিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। আর কুসুমের বিয়ে হয়ে গেলে তার সংসার কে সামলাবে? এখন তো কুসুমকে পেয়ে পটের বিবির মত বসে বসে কাটছে। পরে তো তাকেই আবার সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে হবে। এই দ্বিমুখী চিন্তার স্রোতে তার মাথাটা গুলিয়ে উঠে।

পরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে কুসুমের মামা তার স্ত্রীকে আসল ঘটনাটা বলে তাকে শান্ত করে। তার মামা বলে—'কোলকাতায় একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। বেশ বড়লোক, তার অবস্থা ভাল। কোলকাতার বুকে দোতলা পাকা বাড়ি। বড়বাজারে কাপড়ের দোকান। তবে বয়সটা একটু বেশী, পয়ষট্টি-ছেষট্টি হবে। তা, ব্যাটা ছেলের আবার বয়স দেখে নাকি? ভদ্রলোকের দ্বিতীয়া স্ত্রী বছরখানেক আগে পরলোকগতা হয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ মিলিয়ে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছয়। তার ছোট মেয়েটাই কুসুমের বয়সী। ভদ্রলোকের তৃতীয় বার দারপরিগ্রহণের ইচ্ছা হয়েছে। আমি রাজি হয়ে গেছি। বিয়েতে কোন খরচ করতে হবে না, সব খরচ পাত্র পক্ষের। আর সবচেয়ে দরকারী কথা হল এই যে, এই বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারলে বেশ মোটা রকম ঘটকবিদায় পাওয়া যাবে।'

অর্থাৎ মোটা টাকার বিনিময়ে কুসুমকে বিক্রি করে দেবার পাকা ব্যবস্থা। তার স্ত্রী সবকিছু শুনে খুশি হয় এবং পরের দিন থেকেই কুসুমের উপর নির্যাতনের মাত্রা কমে যায়। হঠাৎ তার মামী বলে—বাপ-মা মরা মেয়ে, সে তো আমাদের মেয়ের মত। বিয়ে না দিয়ে যে আমাদেরই বদনাম হবে।

মামীর এই হঠাৎ পরিবর্তনে কুসুম অবাক হয় এবং আরো জানতে পারে যে আগামী ৫ই ফাল্গুন তার বিয়ে অর্থাৎ আর মাত্র দশদিন পর। কুসুম আকাশ থেকে পড়ে, উথাল-পাতাল চিন্তায় তার মন দুলতে থাকে। এই ক'দিন কুসুমের কাজের চাপ অনেক কম হয়েছে। ভাল শাড়ি দেওয়া হয়েছে পরতে। কুসুম ভাবে, তার অদৃষ্ট কোথায় তাকে নিয়ে যাবে।

মুখ নিচু করে কুসুম তার জীবনকাহিনী শোনাচ্ছে হরিদাসকে। চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে ঝরে পরা জলের ফোঁটা মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

বিয়ের একদিন আগের রাত। কুসুমের ঘুম আসছিল না। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এবং তখনই শুনতে পায় তার মামা ও মামীর অনুচ্চ কণ্ঠের কিছু আলোচনা। সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ভেবেছিল জলে ঝাঁপ দিয়ে বা ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনটা শেষ করে দেবে, কিন্তু তা সে পারেনি। সেই রাতেই একবস্ত্রে বেরিয়ে এসে রেল লাইন ধরে ছুটতে থাকে। ভোর হতে সে একটা স্টেশন এসে প্রথমে যে ট্রেনটি পেল তাতেই উঠে বসল। ট্রেন বর্ধনাম স্টেশনে এসে থামল। সেখানে আর একটি ট্রেনে উঠে বসল। জানে না সে ট্রেন কোথায় যাবে আর তা ভাবার মত মানসিক অবস্থাও তার ছিল না। আমোদপুর স্টেশনে যখন ট্রেনটা এসে

পৌঁছাল তখন বিকাল বেলা। আকাশ ভেঙে বৃষ্টিও নেমেছে তখন। ঘুরতে ঘুরতে চেপে বসল ছোট লাইনের একটি ট্রেনে এবং তার পর এই আখড়ায়। কথা শেষ করে কুসুম চুপ করে মাথা নিচু করে বসে থাকে, হরিদাস বিস্ময়ে হতবাক।

—তাহলে এখন তুমি কি করতে চাও, তোমার তো নিজের লোক বলতে কেউ কোথাও নেই—সস্নেহে হরিদাস বলে।

কুসুমের জীবন-কাহিনী হরিদাসকে বিচলিত করে। ভেবে পায় না এই অসহায় মেয়েটির জন্য সে কি করতে পারে। তার মন চাইছে না, এই অসহায় অবস্থায় মেয়েটিকে এখান থেকে বিদায় দিতে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলে—শোন মেয়ে, তোমার যা অবস্থা তাতে কোন জায়গাই তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আর আকাশের যা অবস্থা তাতে আজ কোন মতেই তোমাকে যেতে দিতে পারি না। তুমি আজকের দিনটা এখানে থেকে যাও আর আমাকেও একটু ভাবার সময় দাও। দেখি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা। হরিদাসের কথা শুনে কুসুম কোন জবাব দেয় না, মাথা নিচু করে বসে থাকে।

হরিদাস উঠে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে থাকে। কিন্তু কাজের মধ্যেও তার মনের মধ্যে চলছে চিন্তার এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। কি করা যায় এই অসহায় হতভাগিনী মেয়েটির জন্য তা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে। সে ভালভাবেই জানে যে এমন একটি যুবতী মেয়ে যদি এই অবস্থায় পথে নামে তবে তার অবস্থা কি হবে। অথচ তাকে রক্ষা করার কোনও উপায়ও তো তার জানা নাই। সারাটা দিন এই চিন্তা নিয়েই কাটল, রাতে বিছানায় শুয়েও দু'চোখ এক করতে পারল না। একটি মাত্র চিন্তায় তাকে সব সময় কুরে কুরে খাচ্ছিল। সারারাত চলল তার বিবেকের সঙ্গে লড়াই। মেয়েটিকে এখান থেকে চলে যেতে দিতে কিছুতেই তার মন সায় দিচ্ছিল না। অনেক ভেবে চিন্তে সে মনস্থির করেই ফেলে, যদিও মন থেকে সম্পূর্ণ সায় পাচ্ছিল না তবে মানবিক কারণেই তাকে এই ব্যবস্থাটি মেনে নিতে হ'ল। এ ছাড়া মেয়েটিকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নাই। সকাল হলে হরিদাস মেয়েটিকে বলে—যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো একটি কথা বলি।

কুসুম মাথা তুলে হরিদাসের মুখের দিকে তাকায়। হরিদাস একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বলে—'তুমি এখানেই থেকে যাও। আমি তো এখানে একাই থাকি। তুমি যদি আপত্তি না কর তা হলে জীবনের বাকি দিনগুলি

তোমাকে নিয়েই সাধন-ভজনে কাটিয়ে দেব। এখন রাজি হওয়া না হওয়া তোমার ব্যাপার, আমি এ ব্যাপারে কোন জোর করব না।'

কুসুম আবার তার অসহায় অবস্থার দাস হয়ে পড়ল। রাজি না হয়েও তার কোন উপায় ছিল না। কারণ মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে বাস্তবকে চিনতে পেরেছিল। তার মত যুবতী মেয়েরা পথেঘাটে কত অসহায় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল।

তখন থেকেই কুসুম আছে হরিদাসের আখড়ায়। গানের গলা তার ভালই ছিল, আর হরিদাসের কাছে তালিম পেয়ে কিছুদিনের মধ্যে সেও একজন বাউল শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পেল। কুসুম আসার পর থেকে হরিদাসেরও যে মরা গাঙে জোয়ার এল। তার কণ্ঠে আবার সুর ফিরে এল, আখড়া আবার জমজমাট হয়ে উঠল।

হরিদাস কুসুমকে নিয়ে একবেলা করে ভিক্ষায় বার হয়। গ্রামের বৃদ্ধ লোক হয়তো রসিকতা করে বলে—মেয়েকে কি শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছ, কই এতদিন তো দেখিনি।

হরিদাস জিভকেটে মাথায় দু'হাত ঠেখিয়ে বলে—না বাবু, মেয়ে কেন হবেন, ইনি যে আমার নতুন বোষ্টমী।

ভাল কপাল করে এসেছিলে হরিদাস, তুমি ভাগ্যবান—বলেই বক্তা হাসতে হাসতে চলে যায়।

এইসব কথাবার্তায় প্রথম প্রথম কুসুম খুব লজ্জা পেত, তবে আস্তে আস্তে সবকিছু গা-সওয়া হয়ে গেছিল।

কিছুদিন হ'ল বাঁকুড়া থেকে ভৈরবদাস বাউলের আনাগোনা বেড়েছে আখড়ায়। ভৈরবের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। গানের টানেই পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, গানের গলাটাও মন্দ নয়। হরিদাসের কাছে গানের তালিম নেয়, থেকে যায় কয়েকটা দিন, চলে যায়, আবার ফিরে আসে মাস দুই পরে। তবে তার বারবার ফিরে আসা কিসের টানে—শুধু কি হসিদাসের গান না অন্য কিছু?

বারবার কোথায় আর যাবে, এখানেই থেকে যাও কিছু দিন গান শেখো ভাল করে—ভৈরবকে উদ্দেশ্য করে হরিদাস বলে। ভৈরব যেন হাতে চাঁদ পায়।

ভৈরব যে কদিন আখড়ায় থাকে কুসুমের মনের মধ্যে আনন্দের ফল্গুধারা বইতে থাকে। তার কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চলাফেরায় তা প্রকাশ পায়। আর এটা হরিদাসেরও নজর এড়ায় না।

একটি কন্যাস্থানীয়া মেয়েকে বোষ্টমী বলে পরিচয় দিতে হরিদাসেরও খুব অস্বস্তি হয়, একটু কুণ্ঠিত হয়েও থাকে বিশেষ করে তার বয়সের কথা ভেবে। তার মনে হয় একটি অন্য পরিকল্পনাও ভেসে আসে। কুসুম এবং ভৈরবকে আখড়ায় রেখে হরিদাস একা একাই ভিক্ষায় যায়, উদ্দেশ্য একটাই, কুসুম ও ভৈরবকে আরো ভালো ভাবে কথা বলার এবং মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া। বয়সের ভারে হরিদাস এখন অনেকটাই কাবু হয়ে পড়েছে। গত বছর জয়দেব মেলায় যেতে পারে নাই। এবার মেলা আসতে কুসুমকে বলে—তুমি যাও, ভৈরবকে সঙ্গে নিয়ে, দুদিন মেলা ঘুরে এসো। ও তো শুধু মেলা নয় আমাদের তীর্থস্থান। দুটো দিন আমি কোন রকমে সামলে নেব।

কুসুমও তাই চাইছিল। দিনের পর দিন এই আখড়ায় এক বৃদ্ধ বাউলের সেবা করতে করতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সেও মুক্তি চাইছিলো এই বন্ধন দশা থেকে। পঁচিশ বছরের তার ভরা যৌবন চাইছিল অন্য কিছু, মাঝে মাঝে তার মনটা বিদ্রোহ করে উঠত।

ভৈরব কুসুমকে নিয়ে রওনা হয় জয়দেব মেলার জন্য মাত্র দু'দিনের জন্য। আজ দু'মাস কেটে গেছে, আখড়ায় ফেরে নাই ভৈরব বা কুসুম কেউই।

এমনটি যে ঘটবে তা হরিদাস আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল এবং পরোক্ষ ভাবে এর সুযোগও করে দিয়েছিল। হরিদাসের এরজন্য কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নাই বরং আছে এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি। হরিদাস আজ সত্যি সত্যিই ভারমুক্ত। হরিদাসের মন এখন মুক্তির আনন্দে ভরপুর। বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল দুটি মুক্ত বিহঙ্গ মনের আনন্দে পাখা মেলে দূর আকাশের নীলিমায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। হরিদাসও তাদের সঙ্গে অনুভব করল মুক্তির স্বাদ।

২

সারাটা বিকাল জানালার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সুজাতা। এটা এখন তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। বিকালের আগেই চুল বেঁধে, গা ধুয়ে, হাল্কা প্রসাধন করে এসে দাঁড়ায় জনালার কাছে। দোতলা বাড়ির পিছন দিকে খানিকটা প্রাচীর ঘেরা জায়গা। কয়েকটা পেয়ারা, আম, কৃষ্ণচূড়া ও নারকেল গাছ। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পার্কটা। মফঃস্বল শহরের এই পার্কটা খুব একটা বড় এবং সাজানো গোছানো নয়। বিকাল হলেই পাড়ার ছোটছোট ছেলেমেয়েরা হাজির হয় এখানে খেলা করার জন্য। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে তাদের নানা রকম খেলা ও হৈ হুল্লোড়। সুজাতা জানালায় দাঁড়িয়ে তাই দেখে সারা বিকাল। ছোটছোট ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে আশ মেটেনা সুজাতার। সন্ধ্যার আগেই যে যার ঘরে ফিরে যায়। সুজাতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানালা ছেড়ে চলে আসে। বুকের ভিতরটা কি একটা না পাওয়ার বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠে। সন্ধ্যা হতেই ঠাকুর ঘরে ঢোকে। পূজা শেষ করে যখন বাইরে আসে তখন রাত নেমে যায়। কাজের লোক বাড়ির আলোগুলি জ্বেলে দেয়। রান্নার মেয়েটি শুরু করে রাতের রান্না।

ছোট নির্ঝঞ্ঝাট সংসার সুজাতা আর বিমলের, কিন্তু তাদের কোন সন্তান নাই। নিঃসন্তান সুজাতার তাই সময় কাটে গান শুনে আর বই পড়ে। মোটামুটি স্বচ্ছল ও সঙ্গতিপন্ন অবস্থা তাদের। বিমলের বড় ব্যবসা—হার্ডওয়্যার ও কাপড়ের দোকান পাশাপাশি। বিমল একাই তা দেখাশুনা করে। ঠাকুরদার আমল থেকে এই ব্যবসা বিমলের এবং বৎসরান্তে বেশ মোটা টাকা আয় হয়।

বসত বাড়িটি বিমলের ঠাকুরদা তৈরী করে গেছেন অনেকখানি খোলা-মেলা জায়গা নিয়ে। পরে অবশ্য বিমলের বাবা বাড়িটার সংস্কার করে আধুনিকিরণ করেন। বিমলকে তার বাড়ির জন্য কিছু করতে হয় নাই। বিমলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, সুজাতা তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। আর্থিক অনটন না থাকলেও বিমল ও সুজাতার মনে আনন্দ নাই। একটিমাত্র সন্তান থাকলেই তাদের ষোলকলা পূর্ণ হত।

এমনিতে বিমল ও সুজাতা সুখি দম্পতি। পরস্পরের প্রতি অগাধ ভালবাসা, বিবাহিত জীবনে তাদের কোন অশান্তি নাই কিন্তু এই নিঃসন্তান দম্পতির মনে যে অন্তঃসলিলা বেদনা তা কেউ কারো কাছে প্রকাশ করে না। তাদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতাবোধই একজন আর একজনকে খুব অন্তরঙ্গভাবে বেঁধে রেখেছে। সুজাতার সব ভাবনাচিন্তা শুধু বিমলকে নিয়ে, বিমলের তরফ থেকেও তার কোন গাফিলতি নাই। তাদের ভালবাসা তৃতীয় জনের মধ্যে ভাগ হয়নি বলেই হয়তো একে অপরকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে আঁকড়ে ধরতে চায়।

বিমল সকাল আটটা নাগাদ জলযোগ সেরে দোকানে যায়। এই সময়টুকু সুজাতার নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। বিমল যা পছন্দ করে সুজাতা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থেকে তা তৈরী করায় তার মনের মতো করে। বিমল চলে যাবার পর সুজাতার হাতে অনেক সময়। রান্নার মেয়েকে রান্নার নির্দেশ দেয় তারপর স্নান ঘরে যায়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করা সুজাতার বরাবরের অভ্যাস। স্নানের পর পূজাপাঠ, ঘণ্টা খানেক প্রায়। এই পূজার ব্যাপারটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়ছে। ঠাকুর ঘর থেকে বেরোলে দেখা যায় সুজাতার কান্নাভেজা ফোলাফোলা চোখ। তার পূজা তো কেবল ঠাকুরের কাছে সন্তান কামনা। কান্নাভেজা গলায় প্রার্থনা করে শুধু একটি সন্তানের— একটি বংশধরের।

সুজাতার বাপের বাড়ি একটু সংস্কারাচ্ছন্ন ধার্মিক পরিবেশের। সব সময় পূজাপাঠ, উৎসব লেগেই থাকে। সুজাতার মধ্যেও এই ধর্মভাবটা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল এবং যতদিন যাচ্ছে তা ততই প্রকট হচ্ছে। বি. এ ক্লাসে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয় সুজাতার। পরীক্ষাটি আর দেওয়া হয়নি। বিয়ের পর বিমল চেষ্টা করেছিল বি. এ পাশ করানোর, কিন্তু সুজাতার তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন সাড়া মেলেনি। সুজাতার গানের গলাও বেশ ভাল। বিয়ের পর বিমল তার গান শেখার ব্যবস্থা করে দেয়। একজন সংগীত শিক্ষক বাড়িতে এসে গান শিখিয়ে যেত। বেশ ভালই শিখছিল গানটা, কিন্তু ইদানীং আর গান গাইতে ইচ্ছা করে না সুজাতার।

এখন সুজাতার সব সময়ের সঙ্গী বই। বিমল নানা ধরনের বই এনে দেয় সুজাতার জন্য। সারাটা দুপুর তার বই পড়েই কেটে যায়। বিমল দুপুরে খেতে আসে বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য। দিবানিদ্রার অভ্যাস তার নাই, খেয়েই আবার বেড়িয়ে পড়ে। রাত ন'টার মধ্যে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরে।

এই সময়টুকু বিমল ও সুজাতার একান্তভাবে নিজস্ব। সুজাতা প্রাণখুলে কথা বলে। সারাদিন যে বই পড়েছে তার গল্প শোনায়। বিমলও তার সারাদিনের জমানো কথা উজাড় করে দেয়।

বিছানায় একে অপরের ঘনিষ্ঠভাবে কাছে আসে। আধো ঘুম আধো জাগরণে বিশ্রান্তালাপ চলে।

'আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না'—বেদনাহত কণ্ঠে সুজাতা বলে, 'না না, সেকি কথা, তুমি আমাকে সব দিয়েছ। আদর, ভালবাসা, প্রেম, শান্তি সব দিয়েছ। কিছুই তো দিতে বাকি রাখো নাই'—সুজাতাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বিমল বলে।

'কিন্তু সন্তান?'—সুজাতার প্রশ্ন।

'সে তো আমাদের হাতে নয়। বিধাতার দান। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না, ভগবান দিলে ঠিকই হবে'—প্রবোধ দেয় বিমল।

সুজাতা কিছু না বলে চুপ করে থাকে। কখন দুজনে তলিয়ে যায় ঘুমের অতলে। বিমল অনুভব করে সুজাতার একাকীত্বের যন্ত্রণা। সারাটা দিন একা একা বাড়িতে কাটানো যে কি কষ্টকর বিমলের সংবেদনশীল মন তা ভালভাবেই বুঝতে পারে। তাই প্রতি রবিবার দোকান বন্ধের দিনে তারা বেড়িয়ে পড়ে কোথাও না কোথাও। নাটক, সিনেমা, খেলা, কাছাকাছি তীর্থস্থান ভ্রমণ কোন কিছুই বাকি থাকত না। সপ্তাহের এই একটা দিন তারা সারাদিন পরস্পরকে কাছে পেত। তাদের অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা ভুলে থাকত।

সন্তান কামনায় তারা ঠাকুর দেবতা, কবচ, তাবিজ কিছুই করতে বাকি রাখে নাই। শেষে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়। কলকাতার ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নেয় দু'জনেই। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায় আসল ঘটনা। সুজাতা সন্তান ধারণে অক্ষম এবং বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে অসহায়। ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল জানার পর থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে সুজাতা। কিছু খায় না, ভালভাবে কথা বলে না বিমলের সঙ্গে, সবসময় শুধু কান্না আর কান্না। বিমল কয়েকদিন দোকানে যাওয়া বন্ধ করে সব সময় সুজাতার কাছে থাকে। নানা ভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। তাতে সুজাতার মন ভরে না।

'আমিই বঞ্চিত করলাম তোমাদের সংসারকে বংশধর থেকে। এরজন্য আমিই দায়ী'—বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পরে সুজাতা।

বিমলের সান্ত্বনা ও সাহচর্যে কিছুদিনের মধ্যে সুজাতার মাথা অনেকটা শান্ত হয়। কিন্তু আগের হাসিখুশি সুজাতা কোথায় হারিয়ে যায়।

কিছুদিন এমনি ভাবেই কাটে। বিমল সুজাতাকে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় এই সব জায়গায় নিয়ে যায় প্রতি সপ্তাহে।

সুজাতার ইচ্ছা হয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার। বলামাত্র বিমল রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি কিনে এনে দেয়। সুজাতা সারাদিন সেগুলি পড়ে আর বিকালে জানালায় দাঁড়িয়ে পার্কে ছোটো ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে।

একদিন দুপুর বেলায় মহাভারত নিয়ে পড়া শুরু করে সুজাতা। আদিপর্বের এক জায়গায় আসে জরৎকারু মুনির উপখ্যান। মহাতপা জরৎকারু মুনি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে কঠোর তপস্যায় কাল যাপন করেন এবং তীর্থে তীর্থে স্নান করে ভূ-মন্ডল পরিক্রমা করেন। একদিন তিনি দেখেন যে প্রকান্ড একটি গর্তের মুখের কাছে অনাহারে ক্লিষ্ট, শীর্ণ কলেবর, অতিশয় দীনহীন তার পূর্বপুরুষগণ একটি কুশগুচ্ছ অবলম্বন করে উর্দ্ধপাদে ও অধোমস্তকে গর্ত্তের অভিমুখে লম্বমান রয়েছেন এবং তাদের পরিত্রাণের জন্য আকুলভাবে কাঁদছেন। একটি মুষিক কুশগুচ্ছের মূলটি ছেদন করছে। জরৎকারু মুনি এই দৃশ্য দেখে খুব দুঃখ পান এবং নিজ তপোবনের অর্ধেক অংশ দান করে তাদের উদ্ধার করতে চান। পূর্বপুরুষগণ এতে সম্মত না হয়ে জানান যে তপোবলে তাদের উদ্ধার করা অসম্ভব কারণ তাদেরও যথেষ্ট তপঃসিদ্ধ আছে। তারা আরো জানান যে তাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় বংশধর। একমাত্র পুত্রই পারে এই পুন্নামক নরক হতে উদ্ধার করতে। জরৎকারু আরো জানতে পারেন যে তিনিই একমাত্র বংশধর যার তপঃপ্রভাবে এখনও পর্যন্ত কুশমূলের কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং তার জীবন শেষ হলেই সবাই গভীর নরকে পতিত হবে।

জরৎকারু এই কাহিনী শুনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ পেলেন এবং তার জন্যই যে বংশলোপ পাবে এই কথা ভেবে তার ব্রম্রচর্য ব্রত ত্যাগ করে দারপরিগ্রহণ করেন এবং বংশরক্ষা করে পূর্বপুরুষগণকে নরক হতে উদ্ধার করেন।

মহাভারতের এই উপখ্যানটি সুজাতার চিন্তার জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। সব সময় ভাবে তার জন্যইতো তাহলে বংশলোপ পাবে এবং বংশধর না থাকলে সবাই নরকে পতিত হবে। উঠতে বসতে এই চিন্তা তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়।

একদিন বিমলকে বলে—'তুমি আমার একটা কথা রাখবে?'

'বল, তোমার কোন ইচ্ছাই তো আমি অপূর্ণ রাখিনি, আর তোমাকে অদেয় তো আমার কিছুই নাই—গভীর মমতায় সুজাতার মাথায় হাত বোলাতে বিমল বলে।

'তুমি আর একটা বিয়ে কর—তাতে বংশরক্ষা হবে। আর তা নাহলে তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই এই চৌধুরী বংশ লোপ পাবে—কান্নাভেজা গলায় কোনোমতে সুজাতা বলে।

বিমল গভীর মমতায় সুজাতাকে কাছে টেনে নেয়—'এ কথা আর বোলো না কোনদিন, তুমি থাকতে আর একজনকে বিয়ে করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। নাই বা রইল বংশধর, দেখো এমন কাজ আমরা করে যাবো যাতে লোক বহুদিন এই চৌধুরী বংশের কথা মনে রাখবে।

সুজাতা কিছু না বলে চুপ করে যায়। কিন্তু তার মনের জ্বালা জুড়ায় না। এখন দিনের বেশিরভাগ সময়ই তার কাটে ঠাকুর ঘরে। খাওয়াপড়ার দিকে কোন নজর নাই। দিনদিন তার শরীরের অবনতি হতে থাকে। অত্যধিক চিন্তা আর অশান্তিতে। সুজাতার শারীরিক অবনতিতে বিমল চিন্তিত হয়। নানাভাবে তাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করে। আর এইজন্য সে দোকানে যাওয়া অনেক কমিয়ে দেয়।

সুজাতার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির। প্রতি সপ্তাহেই বিমল ও সুজাতা নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে যায় আবার নৌকাতেই ফিরে আসে। এতে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে তারা কাটাতে পারে। সকালে গিয়ে সারাদিন দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসে। এই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াটা তাদের নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবেই তারা এক রবিবার সকালে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য তৈরী হয়। বেরোবার মুখে হঠাৎ ব্যবসার ব্যাপারে একটি জরুরী কাজের খবর আসে বিমলের কাছে। সেদিন কোনমতেই বিমলের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। সুজাতাও চেয়েছিল সেদিন না যেতে। কিন্তু বিমল সুজাতার কথা ভেবেই তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেয় সঙ্গে দেয় কাজের লোক আর রান্নার মেয়েটিকে।

সারাদিন দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে ফেরার পথে ঘটে সেই সাংঘাতিক ঘটনা। নৌকা তখন মাঝনদীতে। বেশ জোরে হাওয়া বইছে। হঠাৎ সুজাতা ঝাঁপ দেয় নদীর জলে এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই তলিয়ে যায় গঙ্গার গর্ভে।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। বিমলের মানসিক অবস্থার কথা সহজেই অনুমেয়। কাজকর্মে মন দিতে পারে না। দোকান বন্ধ থাকে দিনের পর দিন। উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে থাকলে সুজাতার স্মৃতি তাকে আরো বেশি করে তাড়া করে বেড়ায়।

একদিন কি মনে করে সুজাতার একটা ছোট হাত বাক্স খুলে দেখে বিমল। সেখানে থাকত সুজাতার আটপৌড়ে ছোটোখাটো দু'একটি গয়না, টুকিটাকি প্রসাধনের কিছু সামগ্রী, অল্প কিছু নগদ টাকা। সেখানে একটি ভাঁজকরা কাগজ খুলে দেখে তারই উদ্দেশ্যে লেখা সুজাতার একটি চিঠি। তারিখটা বেশ কয়েকদিন আগের। বিমল চিঠিটা পড়তে থাকে—

শ্রীচরণেষু—

প্রথমেই জানাই আমার শতকোটী প্রণাম। কিছু বলার আগে তোমার চরণে শতশত বার ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

তোমাকে তো আমি কিছুই দিতে পারিনি। বিবাহিত জীবনের যে পরিণতি—বংশধর, তা আমি দিতে পারিনি। অথচ এক বন্ধ্যা নারীর প্রতি তোমার যে ভালবাসা তা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। আমার ভাগ্য খুব ভাল ছিল তাই তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম। আমার কাজটিকে তোমার হঠকারিতা বলেই মনে হবে—সত্যিই তো হঠকারিতা ছাড়া আর কি। বংশধর না দিতে পারার যন্ত্রণা আমি মেনে নিতে পারিনি। কারণ এখন আমিও তো ঐ বংশেরই একজন। অথচ আমি বেঁচে থাকতে তুমি কোনদিনই দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে না সে তো নিশ্চিত। তাই স্বার্থপরের মত এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমি শুধু আমার যন্ত্রণা থেকেই মুক্তি পেলাম।

জানি আত্মহত্যা মহাপাপ, তবুও এই পথই আমাকে বেছে নিতে হল। শুধু চৌধুরী বংশের পিতৃপুরুষদের কথা ভেবে। আত্মহত্যা করে মহাপাতকী হয়ে আমি অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করব এতে আমার কোন খেদ নাই।

আমার একান্ত অনুরোধ আমার মৃত্যুর পর তুমি আবার একটি বিয়ে করে বংশরক্ষা কর আর চৌধুরী বংশকে নরকের হাত থেকে বাঁচাও। তুমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে নরকে থাকলেও আমার আত্মা শান্তি লাভ করবে। আমার প্রতি তোমার অগাধ ভালবাসার কথা ভেবে আমার আত্মার শান্তির জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা রাখবে।

আমার শতকোটী প্রণাম নিও, ক্ষমা করো।

ইতি— তোমার সুজাতা

৩

আবার পুরনো রোগটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে শরীরে মধ্যে। এটা বেশ বুঝতে পারে ভজহরি। যদিও এ বয়সে এটা আর থাকার কথা নয়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর-তো একেবারেই নয়। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই, শরীরটা একটু সুস্থ হতেই সেই পুরানো সুড়সুড়িটা অনুভব করে মাঝে মাঝে, তখন মনটা একটু আনচান করে উঠে। চেষ্টা করেও ভাবনাটাকে মন থেকে সরাতে পারে না। প্রায় বছরখানেক কঠিন রোগে ভুগেছে ভজহরি। একে বয়সের ভার তাতে কঠিন পরিশ্রম, অনিয়ম এবং খানিকটা অপুষ্টিও। প্রায় পনেরদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সাতদিন তো যমে মানুষে টানাটানি। তবে খুব কঠিন জান এই ভজহরির। অসুখে খানিকটা কাবু করলেও একেবারে শেষ করতে পারেনি।

লম্বা বড়সড় চেহারাটা একটা জীবন্তকঙ্কালে পরিণত হয়েছিল। মুখে কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল। বেশ কিছুদিন খাটিয়ায় শুয়েই কাটিয়েছে, চলে ফিরে বেড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে, উঠে বসেছে, দু'চার পা ফেলতে পেরেছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই লাঠি ধরে চলাফেরা শুরু করেছে। বাড়িতে সেবা যত্ন ও নিয়মিত ওষুধপত্র পেয়ে শরীরের উন্নতি হয়েছে। প্রায় মাস ছয়েক এমনিভাবে কাটিয়ে সে এখন মোটামুটি সুস্থ, তবে আগের মত শারীরিক সক্ষমতা আর নেই।

এখন লাঠি হাতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, বাড়ির হাল্কা কাজে একটু আধটু হাত লাগায়। অবশ্য ছেলে শিবহরি তাকে কোন কাজ করতে দেয় না।

ভজহরির স্ত্রী দামিনী, অতি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ। সাধারণ চেহারা, আটপৌড়ে পোষাক পরিচ্ছদ, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও পতিপরায়ণা। ভজহরি এমনিতে তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসে। এখন দামিনী যেখানে কাজ করে ভজহরি সেখানে তার কাছে গিয়ে বসে। সুখ দুঃখের গল্প করে।

খুব অল্প বয়সেই দামিনী ভজহরির গৃহিনী হয়ে এ বাড়িতে এসেছে। আর এখনতো তারই বয়স পঞ্চাশের উপরে। বিয়ের সময় অল্প বয়স ছিল ভজহরিরও, কত আর হবে, বড় জোর তেইশ কি চব্বিশ। তারপর এই দীর্ঘ

বিবাহিত সাংসারিক জীবন। একমাত্র মেয়ে বিবাহিত, আর ছেলে শিবহরি। বাড়িতে ছেলের বউ আর দুটি নাতি-নাতনি।

দামিনী কাজ করে আর ভজহরি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে। আজ বৃদ্ধ বয়সে ভজহরি যে কথাটা ভাবছে তাতো শুরু হয়েছে সেই ফুলশয্যার রাত থেকে। আর সেই অভ্যাসটাই যেন একটা রোগে পরিণত হয়েছে। একটা দিনও বৌকে ছেড়ে থাকতে পারে না, স্ত্রী সঙ্গ ছাড়া তার ঘুম আসে না। মনে মনে স্মৃতি হাতড়ায় ভজহরি। ছোট থেকেই তার শরীরটা বেশ মজবুত আর সেইজন্যই বোধহয় তার শরীরে চাহিদাটাও একটু বেশি। ছোটবেলায় লেখাপড়া একটু শিখেছিল তবে হাইস্কুলের গন্ডি পেরোতে পারেনি। অভাবের সংসার বলে লেখাপড়া ছেড়ে চাষের কাজেই মনোনিবেশ করে। খাটতে পারত খুব, তাই অল্প জমিজমা থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি ভাবে চলে যেত।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, সন্ধ্যায় একটু ধর্ম্মমূলক বই পড়া, কখনও কখনও কীর্ত্তনের দলে গান করা, আর রাত্রে? তখন আর কোন কিছু নয়, শুধু তারা দু'জন। শরীরের জ্বালা কমলে এক ঘুমে রাত কাবার। বেশ আনন্দেই কাটত দিনগুলি। উদ্দাম যৌবনের রূপ-রস-গন্ধ প্রাণভরে উপভোগ করেছে এবং এখন শরীর ততটা সায় না দিলেও রক্তের মধ্যে দোলা লাগে নিয়মিত। পুরানো দিনগুলি ফিরে পাবার আকাঙ্খা মনের মধ্যে উথাল-পাতাল করে।

বসে বসে ভাবে ভজহরি। আরতো ফিরে পাবে না সেই দিনগুলি। আপশোষ হয় কিন্তু পুরোপুরি হাল ছাড়তে নারাজ।

ছেলে ও মেয়ের জন্ম হল, তারা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। তখন থেকেই দামিনীর মনের পরিবর্ত্তন হয়। এতদিনের উদ্দাম গা ভাসানো জোয়ারে ভেসে যেতে সঙ্কোচ বোধ করে। একদিন বলেই ফেলে—ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, এবার থেকে একটু সমঝে চল। বয়স তো বাড়ছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভজহরির তখন সে সব কথা ভাবার সময় নেই। সে আরো ডুবে যেতে চায় যৌবন জল তরঙ্গে।

দামিনী এটা পছন্দ করে না। সে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। আর এই নিয়েই শুরু হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মান অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি এবং ঝগড়াঝাঁটি। কিন্তু কোন কিছুই ভজহরিকে নিরস্ত করতে পারে না।

দামিনী ভাবে লোকটা পশু নাকি? না বিকৃত মস্তিষ্কের? কেমন স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে তো এমন পাশবিক ভাব থাকতে পারে না। বারবার বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। ভজহরি জোর করে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এমনি ভাবেই চলছিল। ভজহরির ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই বিয়ে হ'ল। কিছুদিনের মধ্যে ছেলের সন্তান জন্মাল, দামিনী ভাবল এবার বুঝি ভজহরির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। নাতিটা দু'তিন বছরের হবার পর থেকেই দামিনী রাত্রে তার কাছে রাখে। উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত পরের সন্তান জন্মাবার আগে বৌমার কাছ থেকে নাতিকে একটু সরিয়ে রাখা আর দ্বিতীয় কারণটা তার অবচেতন মনে কাজ করে। যদি এই অজুহাতে ভজহরির বিছানা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে। একদিন এই প্রস্তাবও দেয় ভজহরির কাছে। কিন্তু তার ফল হয় বিপরীত। ভজহরি চিৎকার চেঁচামেচি করে, ঝগড়া করে, রাগ করে দু'দিন ভাল ভাবে খায় না, কথা বলে না।

ব্যাপারটা জানাজানি হবার ভয়ে বাধ্য হয়ে দামিনী তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। ভজহরি এতে শান্ত হয়। প্রতিরাতে দামিনীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভজহরির অত্যাচার সহ্য করতে হয়। মনটা বিষিয়ে যায়, ভাল লাগে না তার, গা ঘিনঘিন করে, কিন্তু কোন উপায় নেই, বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়।

দামিনী ভাবে বয়সের সঙ্গে এসব তো কমে যাবার কথা, তার তো আর ভাল লাগে না, কিন্তু আর একজনের তো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে।

ভজহরি এখন অনেকটা সুস্থ। চলাফেরার কোন অসুবিধা নেই, এমনকি সাইকেল চালিয়ে কাছেপিঠে যেতেও পারে। রাত্রে একা একা বিছানায় শুতে ভাল লাগে না। আবার সেই পুরানো অভ্যাসটা মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করতে। ভাবে, বয়স তো তিনকুড়ি কবেই পেরিয়ে গেছে, এখন তো রীতিমতো বার্ধক্য, বানপ্রস্থে যাবার সময়। তবুও এখনও কেন এত প্রথম রিপুর তাড়না তা বুঝতে পারে না। এ বয়সে তো ধর্মকর্মে মন দেওয়া দরকার, অন্য চিন্তা তো পাপ। হ্যাঁ, পাপ বৈকি। যে বয়সের যা তাই ভাল লাগে, সবকিছু তো চিরকাল চলে না। পাল্টা যুক্তিও খাড়া করে নিজের মনের মধ্যে। পাপ কিসের? এতো কোন অবৈধ সম্পর্ক নয়, রীতিমতো মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা বৌ, অন্য তো কেউ নয়।

না, সেদিক থেকে ভজহরি খুব সাচ্চা। তার জৈবিক তাড়না, চাহিদা শুধু তার স্ত্রীকে নিয়েই। পরনারীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই।

ভজহরি আরো ভাবে, সবার চাহিদা তো সমান নয়। কেউ অল্পে সন্তুষ্ট, কেউ বেশি চায়। আমার চাহিদা একটু বেশি, তাই এই বয়সেও আরো ভোগ করতে চাই। আমি তো সাধুসন্ত বা মুনি ঋষি নই যে ত্যাগেই সব শান্তি হবে। আমি সংসারী মানুষ। আহার নিদ্রার মত মৈথুনও আমার কাছে ভীষণ দরকারি। আমার ভোগেই শান্তি, ত্যাগে নয়।

অসুস্থ হবার পর থেকে দামিনী প্রতি রাত্রে বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। ভজহরি ঘুমিয়ে পড়লে সে নাতিকে নিয়ে আলাদা বিছানায় শোয়। আজ ভজহরির ঘুম আসছিল না। মনটা উসখুস করছিল, ভাবছিল কথাটা বলবে কি বলবে না। শেষে বলেই ফেলল—বৌ, তোকে একটা কথা বলছিলাম।

—বল, কি বলবে।

—তু, রাগ করবি না তো।

—রাগ করব কেন, বল কি বলবে।

—আর ভাল লাগছে না।

কথাটা শুনে দামিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল এক অজানা আশঙ্কায়। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেন, কেন, কী হয়েছে? শরীর খারাপ করছে না তো?

ভজহরি একটু হেসে বলে—না, না, শরীর তো আমার এখন ভালই আছে। ওর জন্য তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি বলছিলাম অন্য কথা।

দামিনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—তাই বল, যা ভয় পেয়ে গেছিলাম। বল, কি বলবে।

—তু, এবার থেকে আমার কাছে শুবি। একা একা আর ভাল লাগছে না। এখন তো আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি।

—ও, তাই বল।

দামিনী একটু লজ্জা পেল। পরক্ষণেই বলে—না, না, এইতো বেশ আছি। আমাদের তো বয়স হয়েছে, এখন আলাদা থাকাই ভাল। আর নাতিটাও বড় হচ্ছে। ঘরে ছেলে বৌমা আছে, ওরা কি ভাববে। এই বয়সে কেউ একসঙ্গে শোয় নাকি? আমার ভীষণ লজ্জা করে?

দামিনীর কথায় ভজহরি ধাক্কা খেল। সে যে এতে এতো বাধা দেবে তা বুঝতে পারেনি। একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে—কেন, এতে দোষটা কিসের। মাগ ভাতার এক বিছানায় শোবে তাতে খারাপ কি আছে।

ভজহরি রেগে যায়, আর রেগে গেলে তার কথার রাশ থাকে না।

—তুই কি পরপুরুষের বিছানায় শুবি যে লজ্জা করবে। নাকি ঢেমন করিস যে লোকে ছি ছি করবে। ওসব সতীপনা দেখাতে আসিস না। কাল থেকে এক বিছানাতেই আমার সঙ্গে শুবি। আমার এখনও অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

দামিনীও ভজহরির কথায় রেগে যায়। মুখ ঝামটা দিয়ে সেও বলে—আশা আকাঙ্খা আছে। লজ্জা লাগে না। দুদিন আগে মরতে বসেছিলে আর এখন আবার আশা আকাঙ্খা দেখাচ্ছে। বয়সতো কম হল না। এবার থেকে পরকালের কথা ভাব। কোন ভাল চিন্তা নাই, সব সময় বসে বসে এই কুচিন্তা। তা ছাড়া—দামিনী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভজহরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার কথা শুনে। আর রেগে গেলে তার মুখে যে ভাষা আসে তা শোনা যায় না। এবারও ভজহরি মুখ খারাপ করে দামিনীকে গাল দিল।

এতক্ষণ কথাবার্ত্তা চলছিল চাপা গলায় দু'জনেরই মধ্যে। তবে ভজহরির কথাবার্ত্তা আর নিচুস্বরে ছিল না। দামিনী প্রমাদ গুনল। সে জানত রেগে গেলে ভজহরির কোন কান্ড জ্ঞান থাকে না। আর বাড়িতে ছেলে বৌ আছে, তাদের কানে গেলে তো লজ্জায় মরে যাবে। তাই আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে চলে যায় গজগজ করতে করতে।

ভজহরি রাগে ও উত্তেজনায় বিছানায় বসে হাঁপাতে থাকে। দামিনীর কথাবার্ত্তায় তার পৌরুষে আঘাত লাগে। মাথাটা গরম হয়ে যায়। ঢক্‌ঢক্ করে একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ঘুম আসে না ভজহরির। তখন তার মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা জাল বুনে চলছে। দামিনীর এই অবহেলা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নিস্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে এবং মনে মনে তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে।

পরদিন বেশ সকাল সকাল উঠে পড়ে ভজহরি এবং বাড়ির কাউকে কোন কথা না বলে রওনা হয় বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। বাড়ির কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কারণ সকালে ওঠা ভজহরির বরাবরের অভ্যাস। অনেকটা

বেলা হবার পরও যখন সে বাড়ি ফিরল না তখন তার খোঁজ পড়ল। তবে গ্রামের অনেকেই তাকে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে দেখেছে। জেনে বাড়ির লোক খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

ভজহরি হাজির হল এক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুটির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা একটু বেশিই ছিল, পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল। দুদিন সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ততদিনে মাথাটাও একটু ঠান্ডা হয়েছে। তবে বাড়ির অন্য সবার সঙ্গে কথা বললেও দামিনীর সঙ্গে কোন কথা বলে না। দামিনী এতে আঘাত পায়, সবার কাছে নিজেকে ছোট বলে মনে হয় অথচ ঘটনাটা এমন একটি বিষয় নিয়ে যা কাউকেই বলা যায় না। তবে ভজহরির আদর যত্নের কোন ত্রুটি থাকে না। কিন্তু ভজহরি গুম্ হয়ে থাকে।

এমনি ভাবে দিন কাটাতে ভজহরিরও ভাল লাগে না। তার মন থেকে এখন আগের চিন্তাগুলি অনেকটাই চলে গেছে কিন্তু এখন তার মনে বাসা বেঁধেছে এক অন্য চিন্তা।

সে চিন্তার ফলেই সে আবার বেড়িয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে, এবার তার গন্তব্যস্থল একটি আশ্রম। সেখানে গিয়ে ভালভাবেই খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে। আশ্রমের খুব সাধারণ খাওয়া দাওয়া শুধু জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। তাতে ভজহরির কোন অসুবিধা হয় না। এই ধরণের জীবন যাত্রার সঙ্গে সে পরিচিত। সারাদিন আশ্রমের ছোটখাটো কাজে সাহায্য করে। সকাল সন্ধ্যায় খঞ্জনী নিয়ে হরিনাম করে। এমনি ভাবেই কেটে যায় বেশ কিছুদিন। বাড়ির লোক খবর না পেয়ে চিন্তিত হয়। হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য বাড়ি ফিরে আসে। তবে তার অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা কাউকে জানায় না আর কেউ জানতে চেষ্টাও করে না।

দামিনী দেখল ভজহরির শরীরটা আগের চেয়ে আরো রোগা হয়ে গেছে। তার বুকটা ভয়ে দুরু দুরু করে উঠে। কিন্তু ভজহরির কাছ থেকে কোন কিছু জানতে পারে না, তার সঙ্গে কথাও বলে না। ছেলে বৌমা উদ্বিগ্ন হয়ে তার শরীরের অবস্থা দেখে, কিন্তু ভজহরি তাদের সব আশঙ্কা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

এমনি করেই চলতে থাকে ভজহরির আসা যাওয়া। কিন্তু এবার তো প্রায় মাস তিনেক হল তার কোন খবর নাই। বাড়িতে সবাই রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ভজহরির এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে দামিনী ঠাকুরের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে

পড়ে। তার নিজেকে দোষী বলে মনে হয় কিন্তু সে কথা তো কাউকে বলার নয়। নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করা ছাড়া তার আর কিই বা করার আছে।

ক'দিন পর একটি পোষ্টকার্ডের চিঠি এল ভজহরির ছেলের নামে। অপরিচিত ও অস্পষ্ট হাতের লেখা। পাঠোদ্ধার করে জানা গেল ভজহরির বর্তমান ঠিকানার কথা। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় একটি আশ্রমে সে শয্যাশায়ী। দেরী না করে দামিনী তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় সেই আশ্রমে। ভজহরিকে দেখে দামিনী আর চোখের জল সামলাতে পারল না। একি চেহারা হয়েছে ভজহরির। কঙ্কাল সার চেহারা, চোখদুটি কোটরাগত, মুখে একমুখ দাড়ি মাথায় একমাথা রুক্ষ চুল। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভুল বকছে। একটা গাড়ি আনিয়ে স্বামীর মাথাটা কোলে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল। কিছুটা সেবা শুশ্রুষার পর তার জ্ঞান ফিরে এল। চিকিৎসা শুরু হল। এখন জ্বরটা ছেড়েছে তার শরীর ভীষণ দুর্বল, ভালভাবে কথা বলতে পারছে না। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। দামিনী শাড়ির আঁচল দিয়ে তা মুছে দেয়।

পাশে বসে স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভজহরি দামিনীর একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে ধরে থাকে।

দামিনী নিজেকে আর সামলাতে পারে না। কান্না ভেজা গলায় বলে—একি অবস্থা করেছ শরীরের। কিছু হয়ে গেলে আমার কি হতো।

ভজহরি কোন কথা বলে না। চোখদুটো বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দামিনী বলে—আর তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, ঘরেই থাকবে। এবার থেকে আমি তোমার কাছেই থাকব।

ভজহরি তার হাতের মধ্যে ধরা দামিনীর হাতে আলতো করে একটু চাপ দেয়।

–

৪

কেয়ারটেকার

দেওঘর শহরের প্রাণকেন্দ্র ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে বমপাশ টাউন। বেশ উঁচু জায়গা। এ দিকটায় আছে বেশ পুরনো ধরনের অনেক বাগান বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা, উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছ। এই এলাকায় জন বসতি খুব একটা বেশি নয়। বেশিরভাগ বাড়িই সারা বছর খালি পড়ে থাকে একজন কেয়ারটেকারের জিম্মায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষেরা একদিন শখ করে ঐ বাড়িগুলি তৈরী করেছিলেন। মাঝে মধ্যে পূজার সময় বা শীতের প্রাক্কালে একবার করে এসে কয়েকদিন করে ছুটি কাটিয়ে যান। তেমনি একটা বাড়ি মিত্রভিলা। আজ থেকে প্রায় এক'শ বছর আগে তৈরী করেছিলেন শঙ্কর মিত্র। পেশায় তিনি ছিলেন রেলের ঠিকাদার। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বিভিন্ন রেলপথে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং দেওঘরে এসে তার ইচ্ছা হয় একটি বাড়ি করার অবসর যাপনের জন্য। জায়গা কিনে বাড়ি তৈরী করতে সময় লাগে নাই শঙ্কর মিত্রের। কাজ থেকে অবসর নেবার পর প্রায়শই এখানে এসে সস্ত্রীক থাকতেন বছরের বেশিরভাগ সময়। বলতে গেলে দেওঘরের জলহাওয়া ও প্রকৃতির পরিবেশের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর আগে শেষ কয়েকটি বছর এখানেই কাটান তিনি। তার মৃত্যুর পর ছেলে সুধাকর মিত্র বাবার ব্যবসা চালাতে থাকেন। তবে শুধু রেলের কাজ নয় গৃহ নির্মাণ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজেও তিনি হাত দেন। সুধাকর মিত্র তার ব্যবসার জন্য দেওঘরে বেশিদিন থাকতে সময় পেতেন না, তবে বছরে অন্ততঃ দু'বার অবশ্যই এখানে আসতেন এবং সপরিবারে কিছুদিন করে কাটিয়ে যেতেন। শংকর মিত্রের মৃত্যুর পর বাড়িটা পড়েই থাকত একজন মালীর তত্ত্বাবধানে। বাড়িঘর দেখাশুনা করা, বাগান করাই ছিল তাদের কাজ এবং বিনিময়ে তারা নিয়মিত কিছু মাসোহারা পেত।

সুধাকর মিত্রের একমাত্র ছেলে দিবাকর। দিবাকর তার ছেলেবেলায় কয়েকবার তার বাবা মায়ের সঙ্গে এসে কাটিয়ে গেছে, তারপর পড়াশুনার

চাপে আর সবসময় আসার সুযোগ পেত না। তবে অল্প কিছুদিন হলেও দেওঘর ও মিত্রভিলার উপর তার একটা মায়া পড়ে গেছিল। ডাক্তারী পাশ করার পর দিবাকর মিত্র কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন এবং ভাল পসার জমান। বাবা সুধাকর মিত্র কর্মজীবন থেকে অসবর নেবার পর তার বাবার মত তিনিও মাঝে মাঝে দেওঘরে এসে থাকতেন। মিত্র পরিবারের বংশ পরম্পরায় যেমন একটা মায়া পড়ে গেছিল এই বাগান বাড়িটার উপর তেমনি মালীও তার বংশ পরম্পরায় এখানে বাস করত। সুধাকর মিত্রের মৃত্যুর পর দেওঘরে আসা অনেকটা কমে যায় কারণ সদাব্যস্ত দিবাকর বাবুর ইচ্ছা থাকলেও প্রতিবছর এখানে আসতে পারতেন না। বর্তমানে যে মালী আছে তার নাম বুধন।

মিত্র ভিলা বাড়িটি খুব একটা বড় নয়। ছোট দোতলা দাওয়া উঁচু বাড়ি। চার পাঁচটি ধাপ উপরে উঠে বাড়ির বারান্দা, চারপাশে রেলিং ঘেরা এবং চওড়া চাতাল। নিচের তলায় মাঝখানে বড় একটি ঘর—বসার ঘর ও ডাইনিং রুম। একপাশে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর অন্যপাশে পরপর দুটি বাথরুম। উপর তলায় তিনটি রুম ও একটি বাথরুম। প্রায় বিঘা দেড়েক জায়গা উঁচু পাঁচিল ঘেরা, বাড়িটি ঠিক মাঝখানে। গেটের একপাশে গ্যারেজ, অন্যপাশে মালীর থাকার জন্য একটি ছোট বাড়ি ও বারান্দা। সামনে ফুলের বাগান। চারিদিকে পাঁচিলের ধার ঘেঁসে বড় বড় আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারার গাছ। বাড়ির পিছন দিকে ও দুপাশে সব্জী বাগানের জন্য ফাঁকা জায়গা। এখানকার মাটি বেশ উর্বর এবং মালীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা বছর নানা ধরনের সব্জী চাষ হয়। বিশেষ করে শীতকালে বাঁধা কপি, ফুল কপি, মূলো, পালং-এ বাগান ভরে যায়। বুধন খুব পরিশ্রমী। তার পরিবারের সবাই মিলে বাগানে ফসল ফলায়।

সুধাকর মিত্র মারা যাবার পর দিবাকর বাবুও সব সময় এখানে আসার সময় পেতেন না। তাই তিনি মালীর সঙ্গে একটি ব্যবস্থা করে নেন যাতে তাকে বেশী পয়সা দিতে হত না অথচ বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মতই হত। তিনি মাঝে মাঝে ডাকযোগে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতেন মালীর নামে আর বাগানে সব্জী উৎপাদন করে তা থেকে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করে দেন। এই ব্যবস্থায় বুধনও খুশি হয়। বুধন, তার স্ত্রী এবং ছেলে কালুয়া সবাই মিলে বাগানে কাজ করে ফসল ফলায় এবং তার কিছু বিক্রি করে সংসারের কাজে

লাগায়। তবে একটা শর্ত ছিল যে বাড়ি এবং তার আসবাব পত্র সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ কাজে বুধনের কোন গাফিলতি ছিল না। পুরাতন বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তা সব সময় ব্যবহারের উপযোগী করে রাখত বুধন। দিবাকর বাবুও বুধনের মত একজন বিশ্বস্ত মালী পেয়ে বাড়ি সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্তে ছিলেন এবং বাড়িটি বিক্রয় করার কথা চিন্তাও করতেন না। কারণ তার পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি হিসাবে তার কাছে এটি খুব মূল্যবান ছিল। একমাত্র ছেলে বিদেশে লেখাপড়া করতে যাবার পর তিনিও মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন।

এমনি করেই কেটে যায় কয়েক বছর। দিবাকর মিত্রের ছেলে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন আর দিবাকর বাবুরও বয়স বাড়ার জন্য নিজের ডাক্তারী প্র্যাক্‌টিস অনেক কমিয়ে দেন আর অবসর যাপনের জন্য মিত্র ভিলা তো সব সময়েই আছে।

সেবার দুর্গাপূজার কিছুদিন আগে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিবাকর বাবুও দেওঘরে আসেন। শরতের হিমেল হাওয়ার পরশে যখন বাতাসে একটু করে শীতের টান ধরত, আকাশে দেখা যেত শরতের মেঘের আনাগোনা, ইট-কাঠ-পাথরের তৈরী কলকাতা শহর থেকে দূরে কোথাও যাবার ইচ্ছা হতো। এবারে তাই বেশ কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যাবার ইচ্ছায় ট্রেনেই এসেছেন দেওঘরে। অবশ্য আরও একটি ইচ্ছা ছিল যে মধুপুর তার বন্ধুর বাড়িতে দু'চার দিন কাটানো। ট্রেন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সঙ্গের মালপত্র নিয়ে হাজির হন মিত্র ভিলায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গেটের কাছে আসতেই বুধন এসে হাজির হয় একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে। বুধনের শরীর চাদরে ঢাকা মাথায় পাগড়ি বাঁধা। দিবাকর বাবু জানতে পারেন। তার ছেলে কালুয়াই এখন সবকিছু দেখাশুনা করে। বুধনের শারীরিক অবস্থা দেখে দিবাকর বাবু উদ্বিগ্ন হন এবং ঠিক করেন যে মধুপুর থেকে ফেরার পথে তার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে আসবেন। বুধন বেশী কথা বলে না। ঘরগুলি খুলে দেয়। দিবাকর বাবু দেখে খুশি হন যে ঘরগুলি বেশ সাজানো গোছানোই আছে। তখন লোডশেডিং চলছিল। বুধন একটি ল্যাম্প জ্বেলে টেবিলের উপরে রাখে। বুধনের শারীরিক অবস্থা দেখে দিবাকর বাবু জানিয়ে দেন যে রাতের খাবার তাদের সঙ্গেই আছে। রান্না করার দরকার নেই। আরো জানিয়ে দেন যে ভোরেই তারা মধুপুর চলে যাবে এবং দু'এক দিন পর আবার ফিরে আসবেন।

বুধন সবকিছু শুনে ঘাড় নেড়ে শুধু সায় দেয়। বুধনকে বাড়ি যেতে বলেন এবং যাবার আগে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখেন।

রাতটা মিত্র ভিলায় কাটিয়ে বেশ সকাল সকাল দিবাকর বাবু মধুপুর যাবার জন্য তৈরী হন। তখনও বুধন এসে পৌছায়নি। অসুস্থ শরীর ভেবে তাকে আর না ডেকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সব দরজায় তালা লাগিয়ে তিনি বেড়িয়ে যান।

দু'দিন কেটে যায় মধুপুর বন্ধুর বাড়িতে। বিদায় নেবার আগে বন্ধুকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন দেওঘরে আসার জন্য।

দুপুরের আগেই ফিরে আসেন দেওঘরে। দিবাকর বাবুকে আসতে দেখে বুধনের ছেলে কালুয়া তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয়। জিজ্ঞাসা করে—'মালিক, আপনার সামান কোথায়?'

ও, মালপত্র তো আমরা দু'দিন আগেই এখানে রেখে গেছি বাড়িতে, তোমার বাবা সবই জানে'—দিবাকর বাবু বলেন।

আবার জিজ্ঞাসা করেন—'তোমার বাবা কেমন আছে? সেদিন দেখলাম তার শরীরটা বোধ হয় ভাল ছিল না।

দিবাকর বাবুর কথা শুনে কালুয়া বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কোন জবাব দেয় না। তার সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—''মালিক, বাবুজীতো আজ একমাস হ'ল মরে গেছে। আর আমি দু'দিন আগে শ্বশুরাল গেছিলাম একদিনের জন্য বউকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে।

কালুয়ার কথা শুনে দিবাকর বাবু হতভম্ব হয়ে যান। তারও সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। মুখে কিছু না বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর গিয়ে জিনিসপত্রগুলি নিয়ে আসেন এবং কাল বিলম্ব না করে স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

---

৫ থাপ্পড়

আজ কয়েকদিন থেকেই প্রবীর রায়ের মনটা বিরক্তিতে ভরে আছে। তার এই বিরক্তিটা ড্রাইভার সুবোধকে নিয়ে। আজ প্রায় দিন পনের হয়ে গেল সে বাড়ি গেছে তার মায়ের অসুস্থতার জন্য মাত্র তিন দিনের ছুটি নিয়ে। অথচ এখনও তার কোন পাত্তা নেই।

অবশ্য কোলকাতা শহরে ড্রাইভারের অভাব নেই। চাইলেই হাজারটা এসে হাজির হয় কিন্তু সবাইকে ঠিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তবে সুবোধ বাড়ি যাবার আগে তারই পরিচিত একজনকে দিয়ে গেছে। কিন্তু সুবোধের মত বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। সুবোধ শুধু গাড়িই চালায় না, বাড়ির অনেক কাজকর্মও সে করে দেয় আর তার ব্যবসার অনেক কিছুই সে জেনে গেছে এবং ঠিক কখন কোথায় যেতে হবে সুবোধ তা বুঝতে পারে। দরকারী কাগজপত্র সহজেই তার হাত দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো যায়। তাই সুবোধ অনেকটা তার সহকারীর মত।

সুবোধ প্রবীরের বাড়িতেই থাকে বাইরের একটি ঘরে এবং এখানেই তার খাওয়া দাওয়া। সুতরাং তার বেতনের প্রায় সবকটাই বেঁচে যায়। তাছাড়া ছেলে মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসার ব্যাপারেও তারা নিশ্চিন্তে থাকে। অবসর সময়ে সুবোধ প্রবীরের ছেলেমেয়ের খেলারও সঙ্গী। তারা সুবোধকে বাড়িরই একজন বলে মনে করে।

ব্রেকফাস্ট সেরে বসার ঘরে বসে আছে প্রবীর রায়। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে অথচ এখনও বদলি ড্রাইভারের পাত্তা নেই।

স্ত্রী মণিকা কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রবীরের মানসিক অবস্থাটা আঁচ করে বলে—'প্রথম থেকেই বলে আসছি, ড্রাইভিংটা শিখে নিতে, এখন বুঝতে পারছ তো অসুবিধাটা।

প্রবীর কোন কথা না বলে শুধু বলে—হুঁ।

—নিজের গাড়ি আছে অথচ ড্রাইভিং জানবে না এটা মেনে নেওয়া যায় না।

—একটা কথা কতবার তোমাকে বলব। কোলকাতা শহরের এই ভিড়ে গাড়ি চালাতে আমার একদম ভাল লাগে না। তাছাড়া মাথায় হাজারটা চিন্তা নিয়ে ড্রাইভিং না করাই ভাল।

কথাটা মনিকা অনেকবার শুনেছে তাই রুক্ষস্বরে তার বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেলে।

—কলকাতায় আর কেউ ব্যবসাও করে না আর নিজেরা গাড়িও চালায় না। আসলে তোমার সে হিম্মত নেই, সেটাই বল।

কথাটা প্রবীরকে আহত করে। ভিতরে ভিতরে সে জ্বলে উঠে কিন্তু সকালবেলায় এই কথা কাটাকাটি তার ভাল লাগে না বলে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

কিছুদিন থেকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কটা একটু ভিন্ন ধারায় বইছে। সংসারে অভাব নেই কিন্তু কোথায় যেন মনের মিলের একটু অভাব ঘটছে।

ড্রাইভার এসে গেছে। তাকে একটু বকাবকি করে প্রবীর বেড়িয়ে পড়ল। প্রবীরকে পৌঁছে দিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পৌঁছতে আসবে ড্রাইভার।

গাড়িতে যেতে যেতে প্রবীর মনিকার কথাই ভাবছিল। আগের মনিকার থেকে এখনকার মনিকার কত তফাত। চোখ বন্ধ করে পিছনের সিটে মাথাটা হেলিয়ে বসেছিল প্রবীর। মনের পর্দায় অনেক ঘটনা সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠছে। যাদপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় মণিকার সঙ্গে পরিচয়। সে ছিল কলা বিভাগের ছাত্রী। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা এবং শেষ পর্য্যন্ত সাতপাকে বাঁধা পড়া। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান মনিকা, বাবা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিশ করতেন। বালীগঞ্জের বিরাট বাড়ি। মণিকা ধনী পিতামাতার একমাত্র আদুরে সন্তান।

বিয়ের পর প্রবীর আর তার দেশের বাড়িতে ফিরে যায়নি। মণিকাদের বাড়িতেই থেকে গেছিল এবং তাতে মণিকার বাবা-মা খুব খুশি হয়েছিলেন। পাশ করার পর সরকারী চাকরীও পেয়েছিল কিন্তু প্রবীরের মনে ছিল বিরাট ধনী হবার প্রবল ইচ্ছা, তাই চাকরী ছেড়ে শুরু করেছিল ব্যবসা। আর সত্যি বলতে কি, তার এই আশা এখন অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে। সে এখন মোটামুটি একজন ধনী ব্যক্তিই।

হঠাৎ ঝাকুনিতে চিন্তাজাল ছিন্ন হল। ড্রাইভার একজন পথচারিকে মুখ খিস্তি করে জোর ব্রেক করে তাকে বাঁচিয়ে দিল।

তার অফিসেই সুবোধের দেশের বাড়ির একটি ছেলে কাজ করত। ছেলেটি বাড়ি যাবার ছুটি চাওয়ায় তার হাত দিয়েই একটা চিঠি পাঠাল সুবোধকে। তবে চিঠিটা একটু কড়া সুরেই ছিল এবং তাড়াতাড়ি ফিরে না এলে চাকরী যাবার হুমকিও ছিল।

সকাল থেকেই মনটা ভাল ছিল না। অফিসেও কাজে মন বসল না। দু'একটি নির্দেশ দিয়ে দুপুরের আগেই বাড়ি ফিরে এলো।

দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল। মণিকা দেখে অবাক হল। দুপুরে বিছানায় শোয়া প্রবীরের বোধহয় এই প্রথম।

'শরীরটরীর খারাপ নাকি?'—নিস্পৃহ কণ্ঠে মণিকা শুধায়।

'না, শরীর ঠিক আছে'—ততোধিক নিস্পৃহতার সঙ্গে প্রবীর জবাব দেয়।

'তবে মন খারাপ? বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে? তোমার মা—তো এখন ভালই আছেন, তবে এত চিন্তা কেন? চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সা তো তুমি অনেক দিয়েছ। সেখানে তোমার ভাই আছে, সে সব ব্যবস্থা করবে। আর তাছাড়া—

কথাটা শেষ হবার আগেই প্রবীর প্রায় অনুনয়ের সুরেই বলে উঠে—

'প্লিজ মণিকা, আমার মায়ের কথা তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কথা ভাব।'

'তুমিও আর ন্যাকামি করো না। ছোট বাচ্চার মত মায়ের জন্য মন খারাপ করছে। যাও না সেখানে গিয়ে মায়ের সেবাযত্ন করোগে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করা উচিত ছিল, তবে সেটা তোমার জন্যই সম্ভব হ'ল না।'

কথাটা শুনে ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মত গর্জে উঠল মণিকা। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। কাটাকাটা কথায় এরপর যে বাক্যবাণ বর্ষিত হ'ল তা সহ্য করা একমাত্র প্রবীরের পক্ষেই সম্ভব। প্রবীর উঠে বাইরে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর তখনও চলছে মণিকার অবিশ্রান্ত বাক্যবাণ বর্ষণ।

ড্রাইভার ছেলেমেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে। প্রবীরের আজ আর বাইরে যাবার ইচ্ছা করল না। ড্রাইভারকে বলল—মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করো কোথাও বেরোবেন কিনা। আর না গেলে তুমি বাড়ি যেতে পার।

বিকাল হয়ে এসেছে। ঘরের আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে আছে। প্রবীরের অসহ্য লাগছিল। একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। মনটা চাইছিল একটু খোলা হাওয়া। জামা কাপড় পাল্টে কাছেই পার্কে গিয়ে বসল।

পার্কের এক কোণায় একটি বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকল। বিকাল বেলায় নানা লোকের ভিড়ে পার্কটা ভরে আছে। ছেলে-বুড়ো-যুবক-যুবতী সবাই নিজের নিজের মতো করে ঘুরছে, গল্প করছে। প্রবীর বেঞ্চে ঠেস দিয়ে উদাস ভাবে চেয়ে আছে আর মাঝে মাঝে সিগারেট খাচ্ছে।

প্রবীরের দেশের বাড়ি হুগলী জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক, এখন প্রয়াত। বাড়িতে মা, এক ভাই ও তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে। যখন

থেকে মণিকার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া শুরু তখন থেকেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রবীর স্বার্থপরের মত নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেই ব্যস্ত ছিল। অন্য কারো কথা ভাবার প্রয়োজন মনে করত না। তাই ভালবেসে মণিকাকে বিয়ে করার পর যখন তাদের বাড়িতেই থাকতে শুরু করল, সে খুশি হয়েছিল। আর মণিকাই তার বাবা মার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী—সুতরাং ভবিষ্যতের এই হাতছানিটাও সে উপেক্ষা করতে পারেনি।

বিয়ের পর মাত্র একবেলার জন্য মণিকা শ্বশুর বাড়ির গ্রামে গেছিল এবং তাতেই হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং আজ পর্য্যন্ত আর ওমুখো হয়নি। এমনকি প্রবীরের ভাইয়ের বিয়েতেও মণিকা যায়নি। প্রবীরের মা এতে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বাড়ির বড় বৌ হিসাবে মণিকার উপস্থিতি কামনা করেছিলেন। কিন্তু মণিকাকে কোনমতেই রাজি করাতে পারেনি প্রবীর।

প্রবীর কালেভদ্রে গ্রামে আসত একবেলার জন্য এবং মণিকার অমতে এখানে দু'একদিন কাটানোর হিম্মত হ'ত না। পালা-পার্বণে আসার জন্য মা অনুরোধ করতেন কিন্তু তার সে আশা কোনদিন পূর্ণ হয়নি।

এমনি করেই কেটে গেল বেশ কিছুদিন। ইতিমধ্যে প্রবীরের এক ছেলে ও মেয়ের জন্ম হয়েছে। প্রবীরও ব্যবসাতে উন্নতি করেছে।

প্রবীরের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগ শয্যায় শুয়ে প্রবীরকে পাশে পেতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। প্রবীর শুধু তার চিকিৎসার খরচের টাকা পাঠিয়েই তার কর্ত্তব্য পালন করেছিল। যাবার ইচ্ছা থাকলেও মণিকার অমতে তা সম্ভব হয়নি। তখন থেকেই দুজনের মধ্যে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ মণিকার মা ও বাবা মারা গেলে সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রবীর একা পালন করেছে ছেলের মত। প্রতিবেশীরা বলত, জামাই যা করল তা বোধহয় নিজের ছেলেও করত না।

ভাবতে ভাবতে কখন সন্ধ্যা নেমেছে, পার্কের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। লোকজন কমে আসছে, তবুও প্রবীরের উঠতে ইচ্ছা করছে না। যে চিন্তা-স্রোতে এতক্ষণ ভেসে যাচ্ছিল আবার তা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে।

নিজের স্বার্থের কথা ভেবে সে মায়ের প্রতি তার কর্ত্তব্য পালন করতে পারেনি। মাকে এনে নিজের কাছে রাখারও সাহস হয়নি। মণিকার কথার বাইরে তারপক্ষে কিছু করা অসম্ভব। নিজেকে একটি মেরুদন্ডহীন প্রাণীর মত মনে হয়। মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করতে চায় কিন্তু মণিকার সামনে সে কিছুই বলতে পারে না। তাই এই অসহায়তার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়, নিজেকে বড়ই অপরাধী বলে মনে হয়।

এখন বুঝতে পারে কলকাতায় মণিকাদের বাড়িতে থাকাটা তার কত ভুল হয়েছে কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন আর কিছুই করার নেই। মণিকার উপর খুব রাগ হয়, অভিমানও হয় তবে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সাহসটুকু সে হারিয়ে ফেলেছে।

রাতটা কাটল বিছানায় দুপাশে দুজন শুয়ে। প্রবীরের চোখে ঘুম নেই। একটা অপরাধবোধ সব সময় তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সকালে ব্রেকফাস্ট করার পর বসার ঘরে ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করছিল প্রবীর। অফিসের ছেলেটি দেশ থেকে ফিরে এসে সুবোধের একটি চিঠি তুলে দেয় প্রবীরের হাতে।

প্রবীর চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

শ্রদ্ধেয় বাবুসাহেব,

আমার প্রণাম জানবেন। আমার মায়ের শরীর ভাল নেই। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে চলাফেরার ক্ষমতাটুকুও নেই। তিনি এখন পুরোপুরি পর নির্ভরশীল। নিজের হাতে কোন কিছু করতে পারেন না।

বাবু, আমরা তো গরীব মানুষ। লোক রেখে মায়ের সেবাযত্ন করানোর ক্ষমতা নেই। তাই আমার চাকরী চলে গেলেও এই অবস্থায় মাকে ফেলে যাবার কোন উপায় নেই। গর্ভধারিণী মায়ের সেবাযত্ন না করে চলে গেলে আমি কিভাবে ছেলে বলে পরিচয় দেব। চাকরীটা চলে গেলে আবার কোথাও না কোথাও চাকরী পাব কিন্তু অবহেলায় মাকে হারালে তার দুঃখ সারা জীবনও ভুলতে পারব না। মাকেও ফিরে পাব না।

সুতরাং আমাকে ক্ষমা করবেন। মা সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

ইতি সুবোধ

চিঠিটা পড়ে প্রবীর গুম হয়ে বসে রইল। চিঠির কথাগুলি তীরের ফলার মত তাকে বিদ্ধ করতে থাকল। নিজের স্বার্থপরতা, অপদার্থতা ও দায়িত্বহীনতার কথা ভেবে মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল। একজন স্বল্প শিক্ষিত ড্রাইভার তার বিবেকবোধ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আঘাত দিয়ে তার মনিবের বিবেকবোধ জাগ্রত করল। সুবোধের চিঠিটা একটা থাপ্পড় হয়ে সজোরে তার গালে আঘাত করল।

---

৬ আক্কেল সেলামী

সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে যে এমন ফাঁপরে পড়তে হবে তা ভুলেও ভাবেন নাই নরহরি গোলদার। তবে এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। একটা মাত্র গল্প লিখেই যে এমন হেনস্তার শিকার হতে হবে তা জানলে কোনদিনই ও পথে যেতেন না। এখন তার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' এই অবস্থা। এই কয়েকদিনের মধ্যেই তার সুখের সংসারটা ওলট পালট হয়ে গেছে আর নরহরি গোলদার ভেসে চলেছেন হালছাড়া নৌকার মত। এই কদিনেই তার মাথার চুল বিলকুল সাদা হয়ে গেছে, কারণ চুলে কলপ লাগিয়ে দেবার লোক বাড়িতে নেই। এ কাজটা তার স্ত্রী সৌদামিনীই করে দিতেন। স্ত্রী রাগ করে কয়েকদিন ধরেই পিত্রালয়ে আছেন। আর এতসব কাণ্ড কারখানার মূলে তার ঐ গল্প।

আসল ঘটনাটা এবার বলা যাক। নরহরি গোলদারের বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা, লম্বা, শিড়িঙ্গে, হাত-পাগুলি প্যাঁকাটির মত। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তবে চেহারা যাই হোক থাকেন তিনি বেশ পরিপাটি হয়ে। সবসময় পরনে মিহিপাড় ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। দু'হাতে অন্তঃত গোটা ছয়েক রং বেরং-এর আংটি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পায়ে নিউকাট জুতো। এমনি টিপটপ থাকতেই তিনি পছন্দ করেন।

নরহরিবাবুর চারপুরুষের গোলদারির ব্যবসা, আর তার ফলেই পিতৃপুরুষের অর্জিত বিশাল ধনভাণ্ডার। সুতরাং নরহরিবাবুকে তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন ব্যবসা করার দরকার হয়নি। আর এখন গোলদারির ব্যবসাতে তেমন পয়সাও নেই।

নিঃসন্তান গোলদার দম্পতি তাই বেশ বিলাসিতার মধ্যেই জীবনযাপন করেন।

আধা-গ্রাম আধা-শহর এমনি এক জায়গায় তিনি বাস করেন এবং সেখানে তিনিই একমাত্র বিত্তশালী ব্যক্তি। পাড়ায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও অন্যান্য উৎসবে তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

বড়লোক হলেও তার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত। তবে তার কথাবার্তায় তা বোঝা যায় না। ছাত্রজীবনে না থাকলেও এখন তার পড়াশুনার খুব শখ। খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা পড়েন নিয়মিত।

ক্লাবের অল্পবয়সী ছেলেরা নানা ছুতোয় তার কাছ থেকে মোটা চাঁদা আদায় করত বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে। এবার সবাই ঠিক করল পূজার সময় একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠল খরচের। পত্রিকা প্রকাশের টাকা যে শুধু বিজ্ঞাপন থেকে উঠবে না তা সবাই জানত। তাই অনেকেই পিছিয়ে এল এই পরিকল্পনা থেকে। কিন্তু ক্লাবের সেক্রেটারী তারকেশ্বর তলাপাত্র এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সে এই ব্যাপারটার ফয়সলা করতে দু'একদিন ভাবার সময় চাইল। তারকেশ্বরের কূটবুদ্ধির উপর সবার ভরসা ছিল তাই সবাই একবাক্যে রাজি হ'ল।

তিনদিনের মাথায় এক সান্ধ্য বৈঠকে তারকেশ্বর তার মতলবটা সবার কাছে ফাঁস করল। সবাই শুনে হৈ হৈ করে ব্যাপারটা অনুমোদন করল। কেউ কেউ আনন্দে হাততালি দিয়ে 'তারকেশ্বর যুগ যুগ জিও' বলে স্লোগানও দিয়ে উঠল।

ঠিক হল পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে নরহরি বাবুই একমাত্র ভরসা। তার বাড়তি আর্থিক সাহায্য ছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করা অসম্ভব। ক্লাবের সান্ধ্য বৈঠকে সেদিন নরহরি বাবুকে সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হল। কারণ সামনেই দুর্গাপুজো, সেখানে নরহরি বাবুর উপস্থিতিটা অর্থকরী।

সভার অন্যান্য আলোচ্য বিষয় শেষ হয়ে গেলে তারকেশ্বর পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব রাখল। নরহরি বাবুকে নানা ভাবে প্ররোচিত করা হতে লাগল একটি গল্প লেখার জন্য। তিনিই যে এখানে একমাত্র গণমান্য ব্যক্তি তা হাবেভাবে প্রকাশ করা হ'ল। সুতরাং তার একটি লেখা যে পত্রিকার মান অনেকটা বাড়িয়ে দেবে সে ব্যাপারে সকলে একমত এবং তার জন্য যে বাড়তি খরচ হবে তাও যে নরহরি বাবু বহন করবেন এমন প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল এবং তা গৃহীত হল। নরহরি বাবু বিশেষ কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। আরও ঠিক হ'ল যে নরহরি বাবুই হবেন এবারের পূজা কমিটির সভাপতি।

উপর্য্যুপুরি এতগুলি তোয়াজের কথা শুনে নরহরি বাবুও রাজি হয়ে গেলেন এ প্রস্তাবে। সভা ভাঙ্গালে নরহরিবাবুর অনুপস্থিতিতে সবাই তারকেশ্বরের বুদ্ধির তারিফ করল।

এবার শুরু হল নরহরিবাবুর মানসিক যন্ত্রণা। গল্প তো লিখতে হবে, কিন্তু কি নিয়ে লিখবে? দিনরাত তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা। শুয়ে ঘুম আসে না, খেতে বসে আনমনা হয়ে পড়েন। খাবার পড়ে থাকে, হাসিখুশি উধাও হল। কথাবার্তা কমে গেল। নরহরির হল কি। চিন্তায় চিন্তায় পাগল হবার উপক্রম।

গোটা পাঁচেক কলমের ডগা চিবিয়ে খেয়েছেন—দিস্তাখানেক কাগজ কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। লেখা কিন্তু এক লাইনও এগোয়নি।

সৌদামিনী ব্যাপার-স্যাপার দেখে কপাল চাপড়াচ্ছেন শেষে লোকটা পাগল হয়ে যাবে নাকি? প্রমাদ গুণলেন সৌদামিনী। ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে জলপড়া আনিয়েছেন। মা কালীর পুষ্প দিয়ে কবচ তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুতেই নরহরির বিড়বিড়ানি কমে না। সব সময় কি যেন ভাবছেন আর মাথার চুল ছিঁড়ছেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য মাথায় ঘৃতকুমারীর শাঁস আর ভিজে গামছা চাপিয়ে রেখেছেন।

দুপুরবেলা সৌদামিনী কাছে বসে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলেন— হ্যাঁ গো, একটা গল্প লেখার জন্য অ্যাতো ভাববার কি আছে? তুমি আমাকে নিয়েই না হয় একটা গল্প লিখে ফ্যালো।

কথাটা শুনে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেন নরহরি।

—তাই তো! হাতের কাছেই গল্প থাকতে আমি ভেবে মরছি। তুমি আমায় বাঁচালে গিন্নী। এই না হলে কি আর সহধর্মিনী; বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী।

কথাটা শুনে সৌদামিনীর বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। আরও দু'খিলি পান মুখে চালান করে কচ্‌মচ্ করে চিবোতে লাগলেন।

—তুমি দেখো, এমন গল্প আমি লিখব, লোকে পড়ে ধন্য ধন্য করবে অথচ বুঝতে পারবে না কার কথা লিখেছি।

নরহরি তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে গল্প রচনায় ব্যস্ত হলেন।

—কিছুটা লিখে তোমায় দেখাব, তখন বলবে, কেমন হয়েছে।

—না, না, আমি এখন দেখব না, একেবারে ছাপার অক্ষরে বেরোলে তবে দেখব।

—বেশ তাই হবে, বলেই নরহরি আবার লেখায় মনোযোগ দিলেন।

অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে নরহরির গল্প ভূমিষ্ঠ হল। পত্রিকায় ছাপাও হল। আর নরহরির পকেটেও খানিকটা হাল্কা হল।

ষষ্ঠীর দিন ঘটা করে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হল, পত্রিকা প্রকাশ হল এবং বলাই বাহুল্য এসবই হল নরহরি গোলদারের হাত দিয়ে। নরহরির পঁচিশ ইঞ্চি ছাতি গর্বে ফুলে চল্লিশ ইঞ্চি হল। অনুষ্ঠান শেষে পত্রিকা নিয়ে সোজা সৌদামিনীর কাছে হাজির হলেন। স্বামী গরবে গরবিনী সৌদামিনী মুচকি হেসে পত্রিকাটি হাতে নিলেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে শুরু করলেন এবং পড়া শেষ হতেই শুরু হল আসল কাণ্ড।

শো-কেসের কাঁচ ভাঙ্গল, দু'জোড়া কাপ-প্লেট, চারটি কাঁচের গ্লাস, দুটি ফুলদানী আর বিয়ের সময়ে তোলা সৌদামিনী-নবহরির বাঁধানো ফটোটি চুরমার হল। ঘরের বিছানা-বালিশ ভূমিশয্যা গ্রহণ করল আর শুরু হল সৌদামিনীর বাক্যবাণ বর্ষণ।

—এ্যাঁ, আমাকে নিয়ে এই গল্প লেখা হয়েছে? আমি খারাপ, আমি মুখরা। আজ দেখাচ্ছি মজা মুখপোড়াকে। গল্প লেখার সাধ মেটাচ্ছি। নিজের তো পোড়া তেঁতুল কাঠের মত চেহারা আর আমার চেহারা নিয়ে টিট্‌কারী দেওয়া। আসুক একবার বাড়িতে তারপর মজা দেখাচ্ছি।

একটানা এত কথা বলে হাঁফিয়ে উঠেন সৌদামিনী আর সব শেষে মেয়েদের যে শেষ অস্ত্র তার প্রয়োগ। হাউ-মাউ করে কেঁদে পাড়া মাতিয়ে তুললেন।

খবরটা পূজামণ্ডপে নরহরির কানে গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে সৌদামিনীর সামনা-সামনি হতেই আবার বিস্ফোরণ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার দিকে রকেটের মত ছুটে এল একটা কাঁসার থালা। নরহরি কোনরকমে আত্মরক্ষা করে স্থানত্যাগ করলেন। সৌদামিনীর সামনে যাবার আর হিম্মত হল না। বাইরের ঘরে চাকরের মুখে সবকিছু শুনে রাত্রের মত পূজামণ্ডপে থাকাটাই নিরাপদ মনে করলেন।

পূজার ক'দিন নরহরির বাড়িতে আলো জ্বলল না, রান্না হ'ল না। সৌদামিনী পরদিন সকালেই পিত্রালয়ে গমন করলেন।

তখন থেকেই শুরু হয়েছে নরহরির চূড়ান্ত অশান্তি। আপাতত শান্তি স্থাপনের কোন আশা নাই দেখে মনমরা হয়ে পূজা ক'দিন কাটালেন।

ভাবতে লাগলেন সৌদামিনীর মানভঞ্জনের উপায়। পূজা শেষ হল, লক্ষ্মীপূজা গেল, সৌদামিনীর রাগ কমল না। অন্য উপায় না দেখে শেষ অস্ত্র হিসাবে তলব করলেন বনমালী স্যাকরাকে। অনেকক্ষণ ধরে বনমালীর সঙ্গে পরামর্শ হ'ল এবং নরহরির কথামত পরদিন সকালেই সৌদামিনীর পিত্রালয়ে এসে হাজির হ'ল।

'পেন্নাম হই মা'—বিনয়ে বিগলিত হয়ে বনমালী বলে।

'তুই ব্যাটা মুখপোড়া স্যাকরার পো এখানে কেন? ঐ মিন্‌সেটা পাঠিয়েছে বুঝি?'

জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বনমালী বলে—'রামো, রামো, বাবু পাঠাবেন কেন, এই পথেই যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম মা ঠাকরুনের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

'বেশ, এসেই যখন পড়েছ, মিষ্টি জল খেয়ে মানে মানে রাস্তা দেখ'—রাগতস্বরে সৌদামিনী বলেন।

বনমালী অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি। মিষ্টি জল খাবার ফাঁকে কথায় কথায় বলে—'সোনার দাম তো এখন একটু কমতির দিকে, মা ঠাকরুন। তাই বাবু একদিন বলছিলেন এই সময়ে দু'একখানা গয়না গড়িয়ে রাখার কথা। তবে হালে বাবুর সঙ্গে আমার কোন কথা হয় নাই।'

গহনার কথা শুনে সৌদামিনী একটু নরম হলেন। 'আচ্ছা বনমালী, একজোড়া আড়াইপ্যাঁচ তৈরী করতে কত খরচ পড়বে।'

'কত আর, ভরি ছয়েক সোনাতেই যথেষ্ট'—বনমালী সাবধানে টোপ ফেলে।

'বাবুও এই আড়াই প্যাঁচের কথাই একদিন বলছিলেন।'

'বলছিল বুঝি, কই আমাকে তো কিছু বলে নাই'—সৌদামিনীর কণ্ঠে খানিকটা অভিমানের সুর।

'ভুলে গেছেন বোধহয়। আমি বাবুকে গিয়ে বলব?'—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে থাকে বনমালী। সৌদামিনী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকলেন। পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন—'তা দেখা হলে জিজ্ঞাসা করো।'

বনমালী দেখল মাছে টোপ গিলেছে, এবার শুধু ঘাই দিয়ে ডাঙ্গায় তোলা।

'বলছিলাম কি মা, তা হলে মাপটা নিয়েই যাই, বাবু বললেই তৈরী করে দেব।'

সৌদামিনী কোন আপত্তি না করে মাপ দিলেন। বনমালী কার্যোদ্ধার করে মনের আনন্দে খবরটা নরহরির কানে তোলে।

নরহরি সবকিছু শুনে মনে মনে ভাবলেন—'গল্প লিখে যে বোকামি করেছি তার জন্য আক্কেল সেলামী তো দিতেই হবে।'

আড়াই প্যাঁচ তৈরী হ'ল। বনমালীই গিয়ে তা পরিয়ে এল সৌদামিনীর বাহুতে।

সৌদামিনী গয়না পেয়ে খুব খুশি। জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার বাবু কিছু বলে নাই?'

বনমালী হাত কচলে কাঁচুমাচু করে বলে—'আজ্ঞে, বাবু জিজ্ঞেস করতে বলেছেন গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন কিনা?'

'তার আর দরকার নেই, আমি নিজেই যাব।'

পরদিন সকালেই সৌদামিনী নরহরির আলয়ে এসে উপস্থিত হলেন। নরহরির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলেন—'এ কি চেহারা হয়েছে এই ক'দিনে? চুলগুলো একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কলপ লাগাওনি বুঝি?'

নরহরির বুক থেকে পাথরটা নেমে গেল, তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সৌদামিনী কাজের লোককে হুকুম দেন—'এখুনি সাবান আর কলপটা নিয়ে আয়।'

কলপ লাগাতে লাগাতে সৌদামিনী আধো আধো গলায় বলেন—'দেখো বাপু, কালীপূজোতে যেন আর গল্প লিখতে যেও না।'

নরহরি আড়চোখে সৌদামিনীর আড়াই প্যাঁচদুটি এক পলক দেখে কানমলে বলেন—'পাগল হয়েছ? নেড়া বেলতলায় একবারই যায়।'

---

৭ গুণময়ের গৃহত্যাগ

শেষ পর্যন্ত মনস্থির করেই ফেললেন গুণময়, তিনি গৃহত্যাগ করবেন এবং কিছুদিন অন্ততঃ তার জীবনটাকে নিজের মত উপভোগ করবেন। তবে উপভোগ বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নয় এ ক্ষেত্রে। তিনি চান নিজের সঙ্গে একাত্মভাবে কিছু সময় কাটাতে, একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে, যেখানে কোন কোলাহল, অশান্তি, বর্তমান জীবনের অসহিষ্ণুতা কিছুই থাকবে না। আর তার এই চিন্তাটা হঠাৎ নয়, বহু দিনের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার এই পোকাটাও বেশ নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছে। পোকা নয়তো কি? সব মানুষই চায় কর্মজীবনের অবসানে নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে পরিজনদিগকে নিয়ে সময় কাটাতে, কিন্তু গুণময় যেন একটি জীবন্ত ব্যতিক্রম। তবে এখনই কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আরো অনেক কিছু বিচার ভাবনা করতে হবে। গুণময়ের এই হঠাৎ সিদ্ধান্তের পিছনে কারণটা কি? কারণ ছাড়া তো কার্য হয় না।

কে এই গুণময়? গুণময় বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী কর্মচারী, বয়স পঁয়ষট্টি, পেনশনভোগী। চাকুরী জীবনে মোটামুটি উচ্চ পদ থেকেই অবসর নিয়েছেন। সচ্ছল সংসার, সংসারে স্ত্রী বিমলা, পুত্র নিলয়, পুত্রবধু তনিমা আর একমাত্র নাতি তন্ময় বছর দুয়েকের।

গুণময় বাবুর বয়স পঁয়ষট্টি হলেও এখনও বেশ কর্মক্ষম। মোটামুটি লম্বা মেদহীন দোহারা চেহারা। সুগার, প্রেসার, গেঁটেবাত এসব কিছুই নাই। গুণময়কে তার সহকর্মীরা বলে—দাদা, আপনি পঁয়ষট্টি না পঞ্চান্ন বোঝার উপায় নাই, দিন না একটু বলে কিভাবে শরীরটাকে রেখেছেন।

গুণময় হো হো করে হেসে বলেন—'সংযম, ভায়া, সংযম। বেহিসাবী ভাবে চলেছ কি অকাল বার্ধক্য।'

'তাহলে বলেছেন কোমরে কৌপিন এঁটে গেরুয়া পরে থাকতে—' রসিকতা করে বলে সহকর্মীটি। গুণময় ভাবলেন আলোচনাটা একটু আদি রসের দিকে এগোচ্ছে, তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন—'দেখ ভায়া, আমি মানুষ হয়েছি গ্রামে, শৈশব থেকে জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে, গ্রামে তার সুফল তো কিছুটা মিলবেই।'

তাহলে বলছেন গ্রামের মানুষ শুধু মুক্ত বাতাস আর নদীর জল খেয়েই সুখে থাকেন—হেসে বলে সহকর্মীটি।

'পুরোটা না হ'লেও কতকাংশে তা সত্যি'—গুণময় বলেন।

'আমরা যে সময়ে জন্মেছিলাম তখন ফাস্টফুডের যুগ ছিল না। ছিল বিশুদ্ধ ভেজালহীন সাধারণ খাবার, টাটকা শাক-সব্জী, খাঁটি দুধ-ঘি আর ঢেঁকিছাটা চাল'—গুণময় একটু আবেগ ভরেই বলে ফেলেন।

আলোচনাটা হঠাৎ থেমে যায়। দেখেন তারই এক সহকর্মী রিক্সা করে আপদমস্তক ঢাকা দিয়ে কাশতে কাশতে আসছেন। দেখা হলে বলেন—'ডাক্তারখানা থেকে আসছি, গুণময়দা, প্রেসার, সুগার দুটোই হাই। সহকর্মীটির এখনও অন্ততঃ বছর দশেক চাকরী আছে। গুণময়বাবুর মনটা খারাপ হয়ে যায়। সকালে বাজার নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়াল। হেঁটে বাজার করাটা গুণময়বাবুর চিরকালের অভ্যাস।

আগে গুণময়বাবুর গৃহত্যাগের যে কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। তার গৃহত্যাগ লোটাকম্বল সম্বল করে সবার অজান্তে ঘড় ছেড়ে চলে গিয়ে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে গা-ঢাকা দেওয়া নয় বা চিরকালের মত সংসার ছেড়ে চলে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া নয়। তার গৃহত্যাগ হল সাময়িকভাবে সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনটাকে ফিরে দেখা। এই ইচ্ছেটা তার অনেক দিনের এবং এই ইচ্ছেটাকে আরও উসকে দিয়েছে তার স্ত্রীর সাম্প্রতিককালের ব্যবহার আর অসহিষ্ণুতা।

গুণময় ছোটবেলা থেকেই একটু ভাবুক প্রকৃতির। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করেন না। তার চিন্তার জগৎ একটু আলাদা, অন্তর্মুখী। আর এই স্বভাবের জন্য তিনি অনেকের কাছে অপ্রিয়, বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে। নিজে খুব বেশী মেলামেশা করতে না পারলেও তিনি অসামাজিক নন। কিন্তু গল্প করতে, আড্ডা জমাতে যে ধরনের মানসিকতা দরকার তা তার মধ্যে নেই আর এই জন্যই অনেকে তাকে ভুল বোঝে, অহংকারী ভাবে। অনেকের ধারণা তার ভাল চাকরী, ভাল বেতন, ভাল ঘর-বাড়ি এজন্যই অহংকারী। গুণময়বাবু শুনে কষ্ট পান, প্রতিবাদ করেন না। অত্যন্ত বিনয়ী, অমায়িক এবং খুব সংবেদনশীন মানুষ গুণময়বাবু আর এই জন্য তার মানসিক যন্ত্রণাও বেশী। সংসারে সবাই তাকে ভুল বোঝে, তার সহমর্মী কাউকেই খুঁজে পান না।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলে তার একটু সুনাম ছিল অফিসে। সঠিক সময়ে হাজিরা, সময়মত হাতের কাজ শেষ করা এবং অন্যান্য বাড়তি কাজ করার জন্য উপর

মহলে তার একটু কদর ছিল, কোন সমস্যা হলে বড়সাহেবের ঘরে ডাক পড়ত। আর সহকর্মীরাও তাদের ব্যক্তিগত সমস্যায় তার সাহায্য পেত। এজন্য সহকর্মীদের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তার অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার গুণময়বাবুকে একটা মর্যাদার আসন দান করেছিল। আর এই বাড়তি কাজ করার জন্য তার ছুটি হত অফিস ছুটির অনেক পরে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায়দিনই সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। তার নিজস্ব মত ছিল যে কাজ করতে হলে তা করতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে মর্যাদার সঙ্গে, সুনামের সঙ্গে। তাই বলে সংসারের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না, সাংসারিক দায়দায়িত্ব যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতেন।

অফিসের কাজের প্রতি এই অতিরিক্ত আনুগত্য হয়তো তার পারিবারিক জীবনে একটু আধটু প্রভাব ফেলেছিল যা তার স্ত্রীর কথাবার্তায় প্রায়ই প্রকাশ পেত। তবে তিনি স্বীকার করতেন যতটুকু সময় তার স্ত্রী-পুত্রের জন্য দেওয়া দরকার হয়তো ততটা দিতে পারেন নাই, কিন্তু তাই বলে তাদেরকে কোনদিন অবহেলা করেন নাই। আর এসবরে জন্য দায়ী ছিল তার যৌথ পরিবার থেকে গড়ে উঠা মানসিকতা, যা হয়তো ততটা যুগোপযোগী ছিল না।

জেলার সদর শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কুসুমপুর গ্রাম। সেখানে কাকা-জ্যাঠাদের সঙ্গে বিরাট যৌথ পরিবার। জমিজমা, বাগান, পুকুর সবই ছিল। গোলাভরা ধান, গোয়ালে গরু, পুকুর ভরা মাছ কোন কিছুরই অভাব ছিল না। গ্রাম থেকেই তার লেখাপড়া শেষ হয় এবং পাশ করার পর সঙ্গে সঙ্গে সদর শহরে সরকারী চাকরী। অভিভাবকদের ছত্রছায়ায় থেকে সংসারের জন্য আলাদা কিছু ভাবতে হত না, এমন কি বিয়ের পরও। খুব সুখেই কেটেছিল সে সময়টা।

গ্রামে অনেকগুলি বাড়ি, মাটির হলেও টিনের চাল, রেলিং দেওয়া বারন্দা। বাড়িতে কুঁয়া, পায়খানা এবং ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্য দরকারী সব কিছু। কিন্তু সময় তো একভাবে কাটে না। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সংঘাতও। কয়েক বছরের মধ্যে গুণময়ের জ্যাঠা, কাকা ও বাবা মারা যান আর যৌথ পরিবারও ভেঙে যায়। সেদিনের কথা মনে পড়লে গুণময় একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। যৌথ পরিবারের ছোটখাটো অশান্তি একটু-আধটু থাকলেও আনন্দ ছিল, ভরসা ছিল। জমিজমা, ঘড়বাড়ি সব ভাগ হল, গুণময়ও পেলেন তার সম্পত্তি ও বাড়ির ভাগ।

এরপরের ঘটনা গতানুগতিক। গুণময়ের ছেলের জন্ম হয় এবং ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাকেও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হয়।

একমাত্র বসতবাটিখানি রেখে সমস্ত জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে শহরে এসে বাড়ি তৈরী করেন। তখন থেকেই তিনি শহরের বাসিন্দা। কিন্তু গুণময় কি এই নাগরিক জীবন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? এর উত্তর হয়তো আমরা পরে খুঁজে পাব।

মোটামুটি ভাল পদেই চাকুরী করতেন গুণময়বাবু। অভাব ছিল না তাই অনেকটা খোলামেলা জায়গায় তার ছবির মত সাজানো দোতলা বাড়িটা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এমনিভাবেই সময় কেটে যায়, গুণময়বাবুও একদিন কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসরের পর অফুরন্ত সময়। গুণময়বাবু সংসারটাকে আরো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। সংসারের ছোটখাটো কাজেও নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। কলেজে পড়াশুনা করার সময় থেকেই গুণময়ের একটু লেখালেখির নেশা ছিল। অন্তর্মুখী স্বভাবের গুণময়ের খাতা ভর্তি কবিতা ও গল্পের কথা কেউ জানতেও পারে না। তবু লিখে যান, এখন আরও বেশী, লেখাটাই তার নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কেউ পড়ুক বা না পড়ুক। কখনও কখনও তার স্ত্রীকে সংসারের কাজে সাহায্য করেন। এমনি করেই কাটছিল তার অবসর জীবন, তখন থেকেই শুরু হয়েছে তার মানসিক যন্ত্রণাও আর মাথার পোকাটাও আরো বেশী করে নড়াচড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। ছোটোখাটো কথাবার্ত্তায় স্ত্রীর সঙ্গে মতান্তর ঘটে হামেশাই, আর বিমলাও তার দীর্ঘ দিনের বঞ্চিত ক্ষোভ উগরে দেয়। তবে বিমলা যে বঞ্চনার কথা বলে পদে পদে তাকে খোঁটা দেয় তার সবটাই যে ঠিক নয় তা বোঝাবার চেষ্টা করেন আর তার ফল হয় বিপরীত। দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে থাকে বিমলার বাক্যবাণ বর্ষণ, রণে ভঙ্গ দিয়ে গুণময়বাবু চুপ করে যান, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। কিছু দিন পর আবার সবকিছু ঠিকঠাক চলতে শুরু করে।

কিন্তু কথায় কথায় সামান্য ছুতোয় বার বার এই ধরনের আক্রমণে গুণময়বাবুরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তার পৌরুষে আঘাত লাগে। রাগে, অভিমানে তার কান্না পায়। মনটা ঠিক করার চেষ্টা করেন আর মাথায় পোকাটা আরো সক্রিয় হয়। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসেন যে তিনি গৃহত্যাগ করবেন।

হঠাৎ একদিন কথাটা তুলতেই প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে পুত্র ও পুত্রবধূর তরফ থেকে, আর স্ত্রীর শুরু হয় দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ—'ভীমরতি হয়েছে বুড়ো বয়সে, সারা জীবন জ্বালিয়ে শান্তি হল না, আমার তো সাধ-আহ্লাদ

কিছুই কোনদিন পূরণ হল না, আর এখন উনি যাবেন ফুর্তি করতে—বলতে বলতে কেঁদে ফেলে বিমলা। আর তার পরও বিমলার মুখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হতে থাকে তা সহ্য করতে না পেরে গুণময় বাড়ির বাইরে চলে যান।'

ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই থেমে গেল না। পরিবারের সবাই জানত গুণময়ের জেদী ও একগুঁয়ে স্বভাবটা। তাই গুণময় যখন গৃহত্যাগের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন, তখন অগত্যা সবাই নিমরাজি হয়। তারা জানত, রাজি না হলে অশান্তি বাড়বে বৈ কমবে না।

বিমলাও কাঁদতে কাঁদতে বলেত থাকে—'আমিও চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়, থাকুক পড়ে তোমার ঘড়বাড়ি।'

অবশেষে এল সেই দিন। আজ থেকে গুণময় শহরের বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। গ্রামের বাড়িটা সংস্কার করে বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। বাড়ি দেখাশুনার ভার যার উপরে ছিল, ঠিক হয়েছে, সেই সব সময় কাছে থাকবে, রান্নাবান্না করে দেবে। অবশ্য রান্নার জন্য কোন চিন্তা নাই, এ ব্যাপারে গুণময়ও খুব পটু।

অনেক কান্নাকাটি সত্ত্বেও বিমলাকে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন না গুণময়, তার জেদ, তিনি একাই থাকবেন। বিমলা মুখে যাই বলুক না কেন গুণময়ের সুবিধা অসুবিধার কথা সবসময় চিন্তা করে, বিশেষ করে তার শরীরের কথা। তবে গুণময় জানেন বয়স হলেও তার শরীর ততটা খারাপ নয় যতটা বিমলা ভাবে।

বিমলা দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে দেয় চোখের জল মুছতে মুছতে। আর গুণময়? তার মনের অবস্থা কেমন? ভিতরে ভিতরে তিনিও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই পাছে ধরা পড়ে যান এই ভয়ে দু'একটির বেশী কথা বলছিলেন না।

'সঙ্গে মোবাইলটা দিলাম, প্রতিদিন একবার করে ফোন করবে।'—বিমলা অনুরোধ করে।

'নিয়ে যেতে পারি তবে সুইচ অফ্ করা থাকবে, আমার দরকার না হলে কোনদিন ফোন করব না—' গুণময় দৃঢ় স্বরে জানায়।

গুণময় গ্রামে এলেন। কাজের লোক গোবিন্দ সব কিছু গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছে, এমন কি বাথরুমের জল পর্যন্ত। গুণময়ের নূতন জীবন শুরু হল। বিকালবেলায় পৌঁছল কুসুমপুরে। সন্ধ্যা হলেই পাড়ার অনেকে দেখা করতে এল গুণময়ের সঙ্গে। তারাও শুনেছিল গুণময় গ্রামে এসে থাকবে,

কিন্তু শুধু গুণময়কে দেখে তারা রীতিমতো হতাশ হল, অথচ মুখ ফুটে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

গুণময় পুরো বাড়ির আনাচ-কানাচ, খামার বাড়ি, গোয়াল বাড়ি সব ঘুরে দেখলেন। প্রাথমিক বিচ্ছেদের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠার পর তার মনে হল যেন আবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন। দীর্ঘদিন তাকে শহরে বাস করতে হয়েছে ঠিকই, সেটা প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু শহুরে জীবনের সঙ্গে নিজেকে কোন দিনই মানিয়ে নিতে পারেন নাই, কোন আত্মিক যোগ খুঁজে পাননি। শহরের জীবনটা তার খুব মেকি মেকি বলে মনে হয়েছে। তাই আজ সেই মাটির টানে গ্রামে ফিরে আসতে পেরে মনটা খুব হাল্কা লাগছিল।

গুণময় সঙ্গে একটি রেডিও, টেপরেকর্ডার পছন্দমত কিছু গানের ক্যাসেট আর খাতা-কলম নিয়ে এসেছেন। খাবারের কথা ভাবতে হয় না, গোবিন্দ ঠিক সময়মত সবকিছু হাতের কাছে এনে হাজির করে, এমন কি বেড-টি পর্যন্ত।

গুণময় সকালে উঠে একটু বেড়িয়ে আসেন। জমির আল ধরে পুকুরপাড় হয়ে বাগান পর্যন্ত যান আবার ফিরে আসেন। যদিও জমিগুলি এখন বিক্রি হয়ে গেছে তবুও প্রতিটি জমির আল, জমির নাম সবকিছুই মনে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে গুণময়ের বুক থেকে। তার চোখের সামনে ভাসে মাঠভর্তি ধানের পাঁজা, হলুদ সর্ষের ফুল আর সবুজে ভরা সব্জি ক্ষেত সেগুলি একদিন তিনি হাত দিয়ে অনুভব করতেন। একটা নস্টালজিয়া তার মধ্যে কাজ করে।

ফিরে এসে চা-বিস্কুট খেয়ে রেডিওতে খবর শোনেন, গান শোনেন, খাতা-কলম নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু একি হল! লেখার মত একটি কথাও বেরোচ্ছে না মগজ থেকে। অনেকক্ষণ একটা বিষয় নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সব বৃথা। ঘুরে-ফিরে মনের মধ্যে ভেসে আসছে, ছোট্ট দাদুভাইয়ের মুখখানি। পুত্র-পুত্রবধূ-বিমলা সবার কথা মনে পড়ে। গুণময় খাতাকলম রেখে উঠে পড়েন। গোবিন্দর কাছে গিয়ে দু'চারটি কথা বলেন। ফিরে এসে টেপরের্কডারে পছন্দের গান লাগিয়ে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দেন। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তার ভিতরে চলছে এক টানাপোড়েন, সেখান থেকে তিনি কিছুতেই বেড়িয়ে আসতে পারছেন না।

দুপুরে খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নেন, বিকালে বাইরে একটা চেয়ার নিয়ে বসেন। শীতের সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। গরুর পাল ঘরে ফিরছে ধূলা উড়িয়ে। গাড়ি ভার্তি ধান নিয়ে আসছে চাষীরা ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করতে

করতে। গুণময় ফিরে যান তার অতীতের দিনগুলিতে। একদিন তাদের বাড়িতেও এমনি গাড়ি বোঝাই ধান আসত, খামারে তোলা হত। নতুন ধানের গন্ধে ম-ম করত সারা বাড়িটা। সম্বিত ফিরে আসে গোবিন্দের ডাকে— 'আর বাইরে থাকবেন না, হিম পড়ছে, ভিতরে চলুন।'

'হ্যাঁ, যাই'—বলে গা তোলেন গুণময়।

গোবিন্দ আগেই তার বিছানা পরিপাটি করে পেতে রেখেছিল। এককাপ চা খেয়ে বিছানায় উঠে বসেন গুণময়। নিচু স্বরে টেপরেকর্ডার চালিয়ে খাতা-কলম নিয়ে বসেন কিছু লেখার ইচ্ছায়।

কিন্তু একি হল তার! গত কয়েকদিন থেকে শত চেষ্টা করেও একলাইনও কিছু লিখতে পারেন নাই। অথচ আগে লিখতে বসলেই কিছু না কিছু লিখে ফেলতেন। এমনি করেই কেটে যায় কয়েকটা দিন, পুরানো স্মৃতিগুলো রোমন্থন করেন, তাতে কখনও আনন্দ পান আবার কখনও বিষাদে মন ভরে উঠে। মাঝে মাঝেই মনে পরে বাড়ির সবার কথা বিশেষ করে তার ছোট্ট দাদুভাইয়ের কথা।

একদিন সবাইকে ছেড়ে গ্রামে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, ভেবেছিলেন এখানে এসে হয়তো আনন্দ পাবেন, সংসারের খিটিমিটি, কথা কাটা-কাটি থেকে রেহাই পাবেন, মনটা শান্ত হবে আর কিছু লেখা-লেখি করবেন মনের আনন্দে। কিন্তু তার এই মনোবাসনা যে এমনিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে তা কোন দিনই ভাবেন নাই। মাসখানেক কেটে গেছে এমনি করেই। তারই কথা মত স্ত্রী বা পুত্র কোনদিন দেখা করতে আসে নাই, তিনিই দু'একবার মাত্র ফোনে সব খবর নিয়েছেন। তিনি যে সুস্থ আছেন সে খবর পেয়ে স্ত্রী ও ছেলে নিশ্চিন্তে ছিল। কিন্তু তারা কেউ জানত না গুণময়ের মনের খবর। একদিন যে মানসিক অবস্থার জন্য গ্রামে আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন আজ তার ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রথম বসন্তের এক পড়ন্ত বিকাল। বাড়ির গেটে এসে থামল একটি রিক্সা। গুণময়বাবু রিক্সা থেকে নেমে এসে কলিং বেলটা বাজান। বিমলা দরজা খুলে গুণময়কে দেখেই প্রথমে অবাক হয়ে যায় পরে মুচকি হেসে হাঁক দেন—'বৌমা, চায়ের জল চাপাও তাড়াতাড়ি, তোমার বাবা এসেছেন।'

গুণময়বাবু ভিতরে এসে দাদুভাইকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরেন। মনে মনে বললেন—'এই আমার ভাল, এই আমার আনন্দ।'

৮

শঠে শাঠ্যং

টেলিফোনটা আসার পর থেকেই বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। অনেক কষ্টে সে কান্না থামাতে পেরেছেন রামহরিবাবু। বাড়িতে মানুষ বলতে বর্ত্তমানে মাত্র দু'জন। রামহরিবাবু ও তার স্ত্রী সত্যবতী। এখন সারা বাড়ি জুড়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সত্যবতী বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। রামহরিবাবু চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে আছেন বসার ঘরে টেলিফোনের সামনে।

সকালের রোদ এসে উঠোনটার অনেকটাই ভরে দিয়েছে। দু'টি কাক কা-কা করে ডেকেই চলেছে। সত্যবতী সকালে আনাজপত্র বার করেছিলেন কাটার জন্য। রান্নাঘরের সামনে সেগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

আবার কর্কশ স্বরে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রামহরিবাবু কম্পিত হস্তে রিসিভারটা কানে ঠেকালেন।

ওপাশ থেকে বিশ্রী কর্কশ গলায় ভেসে এল, 'ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চান তো দুটি কথা মনে রাখবেন। প্রথমতঃ এক লাখ টাকা জোগাড় করে রাখুন। দ্বিতীয়তঃ পুলিশে খবর দিলে ছেলের বদলে তার লাশ ফেরৎ পাবেন। এর পরের কথা পরে জানতে পারবেন।'

রামহরিবাবু কিছু বলার আগেই লাইনটা কেটে গেল। এর আগে সকালে টেলিফোনটা এসেছিল তাতে জানানো হয়েছিল যে তাদের একমাত্র পুত্র সুপ্রতীমকে অপহরণ করা হয়েছে। সঙ্গে ছিল পুলিশে খবর না দেবার শাসানি।

রামহরিবাবুর একমাত্র সন্তান সুপ্রতীম গতকাল বিকালে তার মামার বাড়ি যাবে বলে বেড়িয়ে গেছে। তাই রাত্রে বাড়ি না ফেরায় বাবা মায়ের মনে কোন চিন্তা ছিল না। আর মাঝে মাঝেই সুপ্রতীম এমনিভাবেই তার মামার বাড়ি যায়।

রামহরিবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং এই বিপদের দিনে তার একমাত্র ভরসা শ্যালক বনবিহারীকে তলব করলেন।

বনবিহারী রামহরিবাবুর চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোট, অকৃতদার, হাসিখুশি মানুষ, বুদ্ধি-পরামর্শ-মন্ত্রণাতে রামহরিবাবুর ডানহাত।

বনবিহারী প্রায়ই তার দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে এসে কয়েক দিন করে কাটিয়ে যায়। ভাগনে সুপ্রতীম তার খুব আদরের পাত্র আর রামহরিবাবুও খুব ভালবাসেন তাকে।

রামহরিবাবু ব্যবসাদার মানুষ। বাজারের মাঝখানে একমাত্র হার্ডওয়ারের দোকান। জমজমাট ব্যবসা। কিন্তু টাকা পয়সা ভাল থাকলেও রামহরিবাবু একটু কৃপণ স্বভাবের। ব্যবসাটা সৎভাবেই করেন কিন্তু একটি পয়সাও এধার ওধার হবার জো নেই। একমাত্র ছেলে সুপ্রতীম, বয়স ২৫/২৬ বৎসর। বি.এ. পাশ করে বাবার সঙ্গেই দোকানে বসে।

বনবিহারী আসার পর রামহরিবাবু অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে সলাপরামর্শ করেন এবং পুলিশে না জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কারণ খবরের কাগজে এমন অনেক ঘটনা শোনা যায় যেখানে পুলিশে খবর দেওয়ার ফলে অপহৃতের জীবন সংশয় হয়েছে। একলক্ষ টাকাও জোগাড় করে রাখলেন।

সকাল থেকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ও ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। খাওয়া-দাওয়া কারো হয় নাই। বনবিহারী প্রায় জোর করে দিদি জামাইবাবুকে একটু খাওয়াতে পেরেছে। সবাই দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে আছে আবার কখন কি খবর আসে।

বিকাল নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠে। ছুটে গিয়ে বনবিহারী রিসিভারটা তুলে নেয়। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে সেই কঠিন কর্কশ কণ্ঠ, 'আজ রাত আটটায় পীরতলার পাশে বড় সাঁকোটার নিচে একা গিয়ে টাকাটা রেখে আসবেন। কোন চালাকি করবেন না। কাল সকালে আপনার ছেলেকে সুস্থ দেহে ফেরৎ পাবেন।'

রামহরিবাবুকে সব কথা জানাল এবং ঠিক হল যে বনবিহারীই টাকাটা নিয়ে যাবে কারণ ভীতু প্রকৃতির রামহরিবাবুর পক্ষে একাজ করা প্রায় অসম্ভব।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। সময় যেন কাটতে চায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘন হতে থাকে। বাড়ির মানুষগুলির উত্তেজনা বাড়তে থাকে। শীতের রাত, সাড়ে সাতটায় বেশ অন্ধকার। একটি ব্যাগে দশটি একশো টাকার বান্ডিল কাগজে মুড়ে বনবিহারী রওনা দেয় নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের দিকে। পীরতলার কাছে সাঁকোর নিচে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে এক হাত দূরের জিনিসও দৃষ্টিগোচর হয় না। বনবিহারী একটু ইতস্ততঃ বোধ করে।

পাশ থেকে ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর।

'টাকাটা সাঁকোর পাশে বড় পাথরটার উপর রেখে চলে যান, পিছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করবেন না। সকালে আপনার ছেলে বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

অন্ধকারে অপহরণকারীরা বনবিহারীকে রামহরিবাবু বলে ভুল করেছিল।

বনবিহারী তাদের কথা মত কাজ করে। বাড়ি ফিরে এসে সব কথা জানায়। আবার শুরু হয় অন্তহীন প্রতীক্ষা। দুঃখের রাত্রি বোধহয় তাড়াতাড়ি শেষ হয় না। বনবিহারী তার দিদি-জামাইবাবুকে আশ্বস্থ করে—

'এত চিন্তা করার দরকার নেই। ওরা টাকা পেয়েছে এবং কথা দিয়েছে সুপ্রতীমকে সুস্থ দেহে ফিরিয়ে দেবে।' কিন্তু মা-বাবার মন এই কথায় কতটা আশ্বস্থ হল তা বোঝা গেল না।

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও মানসিক ক্লান্তিতে সবাই ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ে ঠুক-ঠুক-ঠুক। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন রামহরিবাবু, ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখেন সুপ্রতীম দাঁড়িয়ে আছে—ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসেন। আবার বাড়িতে কান্নার রোল উঠে, তবে সে কান্না দুঃখের নয়, আনন্দের—ছেলেকে ফিরে পাবার আনন্দের। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কান্না কিছুতেই থামতে চায় না। সারা রাত দিন কোথায় ছিল, কেমন ভাবে কেটেছে। অপহরকারীরা তাকে কোন কষ্ট দিয়েছে কিনা, কোন কথাই শুধাবার অবকাশ ছিল না, শুধু ছিল কান্না আর কান্না।

আমরা এবার দেখব কাহিনীর অন্য দিকটা। রামহরিবাবুর প্রতিবেশী রমেশবাবু। প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, অবসর নেবার পর রোগে শয্যাশায়ী, যৎসামান্য পেনশন পান। রমেশবাবুর ছেলে শ্রীশ, মেয়ে চন্দ্রিকা। রামহরিবাবুর পরিবারের সঙ্গে রমেশবাবুর পরিবারের অন্তরঙ্গতা না থাকলেও মোটামুটি যাওয়া আসা ছিল। সুপ্রতীম ও শ্রীশ পরস্পরের ভাল বন্ধু ছিল। ছোটবেলা থেকেই সুপ্রতীম ও চন্দ্রিকার মধ্যে মেলামেশা ছিল, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসায় পর্য্যবসিত হয়।

সুপ্রতীম ও শ্রীশ ছোটবেলা থেকেই একই স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনা করেছে। বি.এ. পাশ করার পর সুপ্রতীম বাবার ব্যবসাতে লেগেছে, শ্রীশ কোন চাকরী বাকরী না পেয়ে কয়েকটি টিউশনি করে।

সুপ্রতীম ও চন্দ্রিকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগের কথা শ্রীশও জানত, এ ব্যাপারে সে কোন বাধা দেয় নাই। আর একজন জানত তাদের ভালবাসার কথা, সে বনবিহারী।

আশ্চর্য লোক এই বনবিহারী। অমায়িক, দিলখোলা ও হাসিখুশি। সুপ্রতীম ও শ্রীশ দু'জনকেই খুব স্নেহ করত এবং বন্ধুর মত ব্যবহার করত। যে কোন সমস্যায় বনবিহারীই ছিল তাদের উদ্ধারকর্ত্তা, মুশকিল আসান। একমাত্র তার কাছেই তাদের মনের কথা খুলে বলতে পারত।

চন্দ্রিকাকে বিয়ে করার কথা সুপ্রতীম প্রথমে বনবিহারীকেই বলে। সব শুনে বনবিহারী বলে, 'সুপ্রতীম, চন্দ্রিকাকে আমি অনেকদিন থেকেই দেখছি। মেয়েটি সুশ্রী, সুন্দরী এবং শান্ত স্বভাবের। তোর সঙ্গে মানাবেও ভাল, কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খটকা আছে, যা তোকে পরে বলব, আমাকে একটু ভাবতে সময় দে।'

কারণ বনবিহারী তার জামাইবাবুকে ভালভাবেই জানত এবং আরও জানত অর্থের প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগের কথা। ছেলের বিয়েতে যে মোটা পণের দাবি করবে তাও তার অজানা ছিল না। সুতরাং গরীব রমেশবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া যে অসম্ভব তা বুঝতে বাকি ছিল না।

একদিন বনবিহারী তার দিদির কাছে নানা কথার পর বলে—'সুপ্রতিম তো বি.এ. পাশ করল, ব্যবসাতেও মন লাগিয়েছে, এবার ওর বিয়ে দেওয়া দরকার।'

সুপ্রতিমের মা কথাটা লুফে নিয়ে বলেন—'ঠিক বলেছিস, আমিও এই কথাটা তোর জামাইবাবুকে কয়েকদিন ধরেই বলব বলব ভাবছিলাম।'

'ঠিক আছে আজই আমি জামাইবাবুকে কথাটা বলব'—জবাব দেয় বনবিহারী।

রাতেই বনবিহারী এই কথাটা তোলে এবং রামহরিবাবুর যে কোন আপত্তি নেই তা জানিয়ে দেন। বলেন—'ভাল দেখে একটা মেয়ে দেখ, তা হলে বিয়েটা সামনের ফাল্গুনেই দিয়ে দেব।'

বনবিহারী বলে—'মেয়ে আমি একটি পছন্দ করেই রেখেছি, এখন আপনার অনুমোদন পেলে এ ব্যাপারে এগিয়ে যাই।'

'কার মেয়ে, কোথায় থাকে?'—জিজ্ঞাসা করেন রামহরিবাবু।

'আমাদের রমেশবাবুর মেয়ে চন্দ্রিকা।'

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকেন রামহরিবাবু।

বনবিহারী মনে মনে প্রমাদ গোণে।

বললেন—'ঠিক আছে, মেয়ের বাবাকে আসতে বল।'

অসুস্থ রমেশবাবু কোনমতে রামহরিবাবুর বাড়িতে এসে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেন। রামহরিবাবু অত্যন্ত বিষয়ী লোক, আলাপ আলোচনায় জানিয়ে দেন নগদ এক লক্ষ টাকা না পেলে ছেলের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

কথাটা শুনে চমকে ওঠেন রমেশবাবু। কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে বলেন—'আমার অবস্থাতো সবই আপনি জানেন, সামান্য কিছু পেনশন পাই, ছেলেটিও বেকার, পণের একলক্ষ টাকা দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমার একমাত্র মেয়ে অত্যন্ত সুশীলা, গৃহকর্মে নিপুণা, সেবাপরায়ণা। তাকে দয়া করে আপনাদের পায়ে স্থান দিন।'

কিন্তু কোন অনুনয় বিনয়েই কাজ হয় না।

'আমার এক কথা, নগদ এক লাখ টাকা ছাড়া বিয়ে দেওয়া অসম্ভব'—বিরক্তির সঙ্গে জানান রামহরিবাবু।

বেশি কথা বলার ক্ষমতা নাই রমেশবাবুর। কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেন।

কথাটা সুপ্রতিমের কানে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বনবিহারী ও শ্রীশকে নিয়ে পরামর্শ সভা বসে।

'কিছু একটা করুন মামাবাবু'—কাতর কণ্ঠে বলেন সুপ্রতীম। বনবিহারীর কপালে ভাঁজ পড়ে, কিছুক্ষণ চিন্তা কবার পর বলে—'কুছ পরোয়া নাই, এ বিয়ে আমি দিয়েই ছাড়ব।'

'কিন্তু একলক্ষ নগদ টাকা?' —শ্রীশ ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

'তারও ব্যবস্থা হবে'—জানায় বনবিহারী।

তার পরের ঘটনা আমাদের জানা। ঠিক হয় সুপ্রতীমকে শ্রীশদের বাড়িতেই লুকিয়ে রেখে অপহরণের নাটক করা হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সুপ্রতীমকে অপহরণ করা হল এবং এক লক্ষ টাকাও আদায় হল। কিন্তু এই অপহরণ নাটকের কথা ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানত না এমনকি চন্দ্রিকাও। যেহেতু শ্রীশ সুপ্রতীমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সুবাদে কখনও কখনও সুপ্রতীম শ্রীশদের বাড়িতে রাত্রিযাপনও করেছে। আর মুক্তিপণ আদায়ের হুমকি দূরের একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে বনবিহারী ও শ্রীশকেই দিতে হয়েছে নিজেদের কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব বিকৃত করে।

অপহরণ নাটক শেষ হবার কয়েকদিন পর শ্রীশ নগদ একলাখ টাকা নিয়ে রামহরিবাবুর বাড়িতে যায় এবং সুপ্রতীমের সঙ্গে চন্দ্রিকার বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে আসে। যথাসময়ে সুপ্রতীমের সঙ্গে চন্দ্রিকার বিয়ে হয়।

রামহরিবাবু কৃপণ লোক। মুক্তিপণের একলক্ষ টাকা বিয়েতে উশুল করা গেছে ভেবে বেশ উল্লসিত। শ্যালক বনবিহারীকে কথায় কথায় মনের এই ভাবটাই প্রকাশ করেছেন। বনবিহারী কিছু না বলে মুচকি হাসে।

রামহরিবাবুর একটা অভ্যাস ছিল মাঝে মাঝে বাড়িতে সিন্ধুকে রাখা টাকার বাণ্ডিলগুলি নাড়াচাড়া করার, একবার করে গুণে দেখার। একদিন টাকা গুণতে গুণতে হঠাৎ তার মনে খটকা লাগে। ভালো করে নোটের বাণ্ডিলগুলি পরীক্ষা করেন এবং বাণ্ডিলে কয়েকটি নোটের উপর একটি বিশেষ চিহ্ন তার নজরে আসে। এ তো সেই নোট, যার উপরে তিনি কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন এবং যে নোটগুলি মুক্তিপণের জন্য দিয়েছিলেন।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল রামহরিবাবুর। তবে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। মনে পড়ে অপহরণ কাণ্ডের সময় শ্যালক বনবিহারীর কিছু কথাবার্তা ও তার চালচলন। কিন্তু তিনি চালাক লোক এবং বনবিহারীকে ভালবাসেন খুব। বনবিহারী ছাড়া তার এক মুহূর্ত্তও চলে না। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি জলঘোলা করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে তিনি রাজি নন। গোটা অপহরণ কাণ্ডে যে কে জড়িত তা বুঝতে বাকি থাকে না।

একমাত্র সন্তানের প্রতি তার দুর্বলতার কথা তো তিনি ভালভাবেই জানেন। তার শ্যালকের সঙ্গে তার ছেলের অন্তরঙ্গতার কথাও তার অবিদিত নয়। আর চন্দ্রিকা ও সুপ্রতীমের ঘনিষ্ঠতার কথাও তার একটু আধটু জানা ছিল। সুতরাং বনবিহারীর চন্দ্রিকার সঙ্গে সুপ্রতীমের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যে নেহাৎ কাকতালীয় ব্যাপার নয় তা বুঝতে বাকি থাকে না। তাই বিয়ের জন্য একলাখ টাকা পণ চেয়ে তিনি নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেন। একমাত্র পুত্রের সুখের জন্য সমস্ত ঘটনাটা তিনি বেমালুম চেপে যান এবং কাউকে এই ব্যাপারটা বুঝতে দেন না। তাই কিছু না বোঝার ভান করে কিল খেয়ে কিল হজম করেন।

---

৯ কানিকুড়োর মা

ভোট এলে কানিকুড়োর মার খুব আনন্দ হয়। লোকে তাকে এই নামেই ডাকে। তার আসল নাম অবশ্য একটা আছে, কিন্তু সে নামে কেউ তাকে ডাকে না। সবাই তাকে কানিকুড়োর মা বলে। আর এতে সে খুব খুশিও হয়। যতই হোক কানিকুড়ো তো তার ছেলেরই নাম।

ভোট এলে কানিকুড়োর মা'র খুশি হবার দুটি কারণ। প্রথমতঃ তার মত বাউণ্ডুলে মহিলার পক্ষে নানা খবর সংগ্রহ করা খুব সহজ হয় আর অবসর সময়ে তার সংগৃহীত খবর শোনার শ্রোতাও অনেক পায়, বিশেষ করে মহিলা মহলে। আর নানা ধরনের খবর পরিবেশন করে সেও খুব আত্মতৃপ্তি লাভ করে। লোকে তার খবরকে গুরুত্বও দেয়। আর দ্বিতীয় যে কারণটি তাকে খুশি করে সেটা হল ভোট উপলক্ষ্যে কখনও কখনও সামান্য প্রাপ্তিযোগ। সে প্রাপ্তিটা শুধু বাবুদের মুখের কথা নয়। ভোটের আগের রাত্রে কিছু নগদ প্রাপ্তি, আর এই দিনটির জন্য সে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে।

আজই সেই দিন, অর্থাৎ আজ বাদ কাল সকাল থেকেই ভোট। তাই কানিকুড়োর মাকে আজকের দিনটা একেবারে অনেক রাত পর্যন্ত চোখকান খোলা রাখতে হবে। কখন পার্টির লোক আসবে, কত টাকা দেবে সেটা না থাকলে তো বোঝা যাবে না। তাই সন্ধ্যা থেকেই তার ব্যস্ততা খুব বেড়ে যায়। চরকির মত ঘুরতে থাকে এপাড়ায় ওপাড়ায়। আর এছাড়া তো কোন উপায়ও নেই। কাছে না থাকলে তো ঐ মুখপোড়া মেম্বারই তো বেশির ভাগ টাকাটা মেরে দেবে। আর সামান্য কিছু বিলি করবে। যা শয়তান ঐ আঁটকুড়োর বেটা মেম্বার মুখপোড়াটা। তবে এসব কথা তার মনেই থাকে, বলতে পারে না। যদিও উচিত কথা বলতে তার একটুও বাধে না। ঠোঁট-কাটা বলে পাড়াতে তার একটু বদনামও আছে।

কিন্তু আজকের ব্যাপারে তো মেম্বারকে জোর করে কিছু বলতেও পারবে না। যদি চটে যায় তা হলে সারা বছর যেটুকু চাল, গম সরকারি সাহায্য পায় তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আজ সে কিছু না বলে শুধু দেখে ও শুনে যাবে কত টাকায় রফা হচ্ছে এবং তার প্রাপ্য পাওনা সে পাচ্ছে কিনা। যদিও তার বাড়িতে সে-ই একমাত্র ভোটার তাই তার পাওনার পরিমাণটাও কম। তবুও যা পাওয়া যায়। কখনও ভাবে কানিকুড়োটা যে কখন বড় হয়ে ভোট দেবে,

তাহলে তো দু'জনের টাকা পাওয়া যেত। মাঝে মাঝে আপশোষ করে কেন যে কানিকুড়োটা তাড়াতাড়ি বড় হয় না। আর কানিকুড়োর যা চেহারা তাতে বয়স বাড়লেও তা বোঝা যায় না। এখন তের-চোদ্দ বছর বয়স অথচ দেখলে মনে হবে আট-দশ বছরের। আর হবেই বা না কেন। মাতাল বাপের শরীরে পদাথ বলে কি কিছু ছিল যে হৃষ্টপুষ্ট ছেলের জন্ম দেবে। পাঁচটা মরে মরে এই একটাই বেঁচে আছে তাই যথেষ্ট। এই কথাগুলি প্রায়ই কানিকুড়োর মায়ের মনে হয়। রুগ্ন অসুস্থ ছেলে জন্মাতে জন্মাতেই মরে যেত, তাই এই শেষেরটা যখন টিকে গেল তখন সবাই বলল এর নাম রাখ কানিকুড়ো। বিচ্ছিরি একটা নাম রাখলে তাহলে একে যমেও ছোঁবে না। তাই তার ছেলের নাম হল কানিকুড়ো আর তখন থেকেই সে হয়ে গেল কানিকুড়োর মা।

কানিকুড়ো টিকে গেল তবে খুব শীর্ণকায় এবং অসুস্থ। মাথাটা বড়, পেট মোটা, শরীরটা শুধু চামড়ায় ঢাকা। আর বুদ্ধিতেও সে অনেকটা পিছিয়ে। তার বয়েসি ছেলেরা এখন দিব্যি খেটেখুটে খাচ্ছে আর কানিকুড়ো এখনও তার মায়ের আঁচল ধরে ঘুরছে। সবই অদৃষ্ট, তা নইলে এমন হবেই বা কেন।

ভাবতে ভাবতে স্মৃতির সরণি বেয়ে অনেক দূর চলে যায় কানিকুড়োর মা। কানিকুড়োর বাবার চেহারাটা বেশ তাগড়াই ছিল, কাজকর্ম করার চেয়ে দাদাগিরি করতেই বেশি ভালবাসত। আর এই জন্যই সে পার্টির লোকের নজরে পড়ে যায়। তাদেরও পার্টির কাজের জন্য এমনি একজন দাপুটে লোকের দরকার ছিল। কানিকুড়োর বাবা পার্টিতে যোগ দিল আর তখন থেকেই তার কার্যকলাপ আরো বেড়ে গেল। মেজাজটা তার বরাবরই একটু রুক্ষ প্রকৃতির আর পার্টির কাজের দায়িত্ব পেয়ে তা আরও বেড়ে গেল। একে একে নির্বাচন আসতে লাগল। দিনরাত নাওয়া-খাওয়া ভুলে পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পঞ্চায়েত, বিধানসভা আর লোকসভার নির্বাচন তো এখন লেগেই আছে প্রায় বছর বছর, আর এই কাজ করতে করতে পার্টিতে তার খুব নামও হল। শুধু এখানেই নয় কলকাতায় পার্টি মিটিং থাকলে লোকজন জড়ো করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার উপরেই থাকত। এই কাজটা সে ভালভাবেই করতে পারত। হাত খরচা হিসাবে কিছু টাকা পেত আর নগদ টাকা হাতে আসতেই মদ খেতে ধরল। যা টাকা পেত তার বেশির ভাগটা মদেই খরচ করত, সামান্য কিছু দিত সংসার খরচ।

সব সময় পার্টির কাজে ঘুরে বেড়াত, বাড়িতে আর কদিনই বা থাকত। একটা নতুন নেশায় সে মেতে উঠেছিল। তবে মদ খেয়ে নেশা করলেও কোন

দিন সে মাতাল হত না, পার্টির কাজটা বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই করত। আজ এখানে তো কাল ওখানে, ঘুরেই বেড়াত, মাঝে মাঝে হঠাৎ বাড়ি ফিরে এসে দু-এক রাত কাটাত।

তার কার্যকলাপ দেখে কানিকুড়োর মা বেশি কিছু বলতে সাহস পেত না। পার্টিই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান, আর তখনও সে কানিকুড়োর মা হয় নাই। একবার বেশ ক'দিন বাড়িতে ছিল আর সেই সময়েই কানিকুড়োর উন্মেষ ঘটল মাতৃ জঠরে।

কানিকুড়ো যখন সাত-আট মাস পেটে তখন আবার তার স্বামী মিটিং করতে কলকাতায় গেল। এবার আইন অমান্য আন্দোলন, ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে।

সেই তার শেষ যাওয়া। অনেক লোকজন যোগাড় করে সে কলকাতায় নিয়ে গেছিল বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিতে। তবে সেদিনের বিক্ষোভ মিছিল শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকে নাই। অশান্ত হয়ে উঠেছিল হাজার হাজার লোকের জনতা। ট্রামে বাসে আগুন লাগানো হয়েছিল, হয়েছিল দোকান ভাঙ্গচুর ও লুটপাট। মারমুখী জনতাকে সামলাতে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল আর তাতেই শহীদ হয়েছিল কানিকুড়োর বাবা।

অনাথ হয়ে পড়েছিল কানিকুড়োর মা। পার্টির নেতারা এসে সান্ত্বনা আর সঙ্গে কিছু টাকাও দিয়ে গেছিল। সেই টাকারই কিছু অংশ জমা আছে পোষ্ট অফিসে এবং তাতেই কোন মতে চলে তার সংসার।

এরপর কানিকুড়ো জন্মাল, আজন্ম অসুস্থ এক শিশু। আর তার চিকিৎসা করাতেই খরচ হয়ে গেল বেশ কিছু টাকা।

এরপর থেকে কানিকুড়োর মাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়েছে। কোথাও কোন মিটিং হলেই তাকে সেখানে নিয়ে যেত। তাকে হাজির থাকতে হত জনসভায়। খুব লজ্জাও করত তার। বিরাট জনসভার মঞ্চে তাকে বসে থাকতে হত চেয়ারে একপাশে। নেতারা তার স্বামীর অনেক কথা বলত। সে মুখ নিচু করে বসে বসে শুনত। অনেক সময় তাকেও কিছু বলতে অনুরোধ করা হত, কিন্তু এত লোকের সামনে মুখ ফুটে কোন কথা কোন দিনই বলতে পারে নাই। তবে এটা ঠিক যে সভায় নিয়ে গেলে তার কিছু নগদ প্রাপ্তি ঘটত। তাই ভাল না লাগলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যেতে হত। জমানো টাকার অনেকটা খরচ হয়ে গেছে কানিকুড়োর পিছনে আর যেটুকু আছে তাতে আর হাত দিতে চায় না কানিকুড়োর ভবিষ্যৎ ভেবে।

দেখতে দেখতে কানিকুড়ো অনেকটা বড় হল আর এখন তার মাকে নিয়ে পার্টির আর আগের উদ্দীপনাও নাই। বয়স বেড়েছে কানিকুড়োর মার, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, মাথায় চুলে তেল পায় না নিয়মিত। শুধু একখানা মলিন শাড়ি বা ধুতি পড়েই থাকতে হয়। সায়া ব্লাউজ সে তো কালে ভদ্রে পড়ে।

এতদিনে তার স্বামীর অবদানের কথা অনেকেই ভুলে গেছে আর পার্টির লোকের কাছে তার কদরও অনেক কমে গেছে। এখন তার অবস্থা প্রায় ভিখারীর মত। মাঝে মাঝে কিছু সরকারী সাহায্য আর এটা-ওটা করে চলে কোনরকমে।

মায়ের দেখাদেখি কানিকুড়োও ভোট নিয়ে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে দেখে এসেছে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভোটবাবুরা এসে গেছে। ছুটে এসে মাকে খবর দেয়—মা, মা, ভুটবাবুরা চলে এসেছে। কাল তো ভুট হবে, কি মজা, কি মজা!

আনন্দের আতিশয্যে সে নাচতে থাকে। তবে একটা ব্যাপারে সে একটু ভয়ও পেয়েছে—বুঝলি মা, ইবারে ভুটবাবুদের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে পুলিশ এসেছে। আমাদের মতন পুলিশ লয় গো। কি চেহারা, দেখলেই ভয় লাগছে। আর কাউকে কাছে যেতে দিছে না। আমি তো অনেক দূরে থেকে দাঁড়িন দাঁড়িন দেখলাম।

কানিকুড়োর মা একথা আগেই শুনেছে। তার কানে তো সব খবরই আসে। এবারে ভোটে নাকি খুব কড়াকড়ি হবে আর ভোটের পরিচয়পত্র ছাড়া ভোট দিতেও দেবে না।

কানিকুড়োরও নাই নাই করে বেশ কয়েকটি ভোট দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কারণ এখন ভোট প্রায় বাৎসরিক একটা উৎসব।

ভোট এলেই দেওয়াল লিখন শুরু হয়। সব দলের লোকই আসে, কেউ দিনের বেলায়, কেউ রাতে। নানা রকম রং দিয়ে কত কি লেখে, ছবি আঁকে। কানিকুড়ো তাদের অর্থ বুঝতে না পারলেও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তবে কোন দলের কোন চিহ্ন সেটা সে জানে। কোন দলের লেখা ভাল হল, কারটা খারাপ এই নিয়ে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তারাও এক-একটা প্রতীক চিহ্নকে ভালবেসে ফেলে। গ্রামের মধ্যে মিছিল বার হয়। সে সব দলেই থাকে, তবে পিছনের দিকে। কখনও কখনও হয়তো কঞ্চিতে লাগানো একটা ছোট দলীয় পতাকা বহনের দায়িত্ব পায়, তখন তার আনন্দ দেখে কে।

ওর মাকে শহরে যেতে হয় মিছিলে ডাকলে, সঙ্গে সেও থাকে। নানা রকম শ্লোগান দেয়, কানিকুড়ো তার কোন অর্থ বুঝতে পারে না। সে তার মায়ের সঙ্গে শহরে আসতে পায়, এতেই আনন্দ। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দু'পাশের দোকান, বাড়িঘর দেখতে দেখতে যায়। মিছিল শেষে অনেক সময় এক ভাঁড় চা এক টুকরো পাঁউরুটি পাওয়া যায়। কানিকুড়ো তাড়িয়ে তাড়িয়ে খুঁটে খুঁটে খায় পাঁউরুটিটা।

কিন্তু এবারের ভোটে সে একেবারেই আনন্দ পায় না। ভোট হচ্ছে অথচ দেওয়ালে লেখা হচ্ছে না, মাইক নিয়ে মিছিল হচ্ছে না এটা সে কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না। মাকে তাই বলে—ই কি রকম ভুট বলতো, দিয়ালে কিছু লিখছে না, কাগজ চিটাইছে না, ভুট বলে তো মনেই হছে না। কত রঙিন কাগজ মালা করে টাঙানো হয় গোটা গাঁয়ে, দেখতে কত ভাল লাগে বলতো। ইবারে ইসব কিছুই করলে না।

তবে এ বছর একটা বিষয়ে সে খুব খুশি হয়েছে। দলের চিহ্ন আঁকা একটা গেঞ্জি সে পেয়েছে এবং বলেছে সেটা সব সময় পড়ে থাকতে। তাই মাপে বড় হলেও সে গেঞ্জিটা সব সময় গায়ে দিয়ে আছে ক'দিন ধরে আর ভাবে—ইবার জারের সময় গেঞ্জিটা খুব কাজে লাগবে।

রাত পোহালেই সকাল থেকে ভোট শুরু হবে। ভোট দেবার ব্যাপারে কানিকুড়োর মায়ের উৎসাহ বরাবরই একটু বেশি। সাতসকালে সব কাজ ফেলে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয় আর নিজের ভোটটা দিয়ে খুব আনন্দ পায়। তার স্বামী বেঁচে থাকতে অনেক কথাই শুনেছিল। সে বলত যে ভোট দেওয়া সবারই অবশ্য কর্তব্য। স্বাধীন দেশের নাগরিকের ভোট দেওয়া খুব জরুরী, কারণ ভোট দিয়েই জনগণ ঠিক করবে কারা দেশ শাসন করবে, জনগণের ভালমন্দের কথা ভাববে।

তবে এত বড় বড় কথা কানিকুড়োর মায়ের মাথায় ঢুকতো না, একমনে স্বামীর কথাগুলি শুনে যেত। তবে এটা জেনেছিল যে ভোট দিতে হয়। তা নষ্ট করতে নাই। সেই ধারণাটা এখনও তার মনে গেঁথে আছে। আর তাই আজ ভোটের আগের দিন একমাত্র ভাল শাড়িটা পরিষ্কার করে রেখেছে, চুলে দেবার তেলও জোগাড় করেছে আর হাঁড়ির ভিতরে রাখা ভোটের পরিচয়পত্রটাও বের করে সামনে রেখেছে।

কিন্তু এত সবের মধ্যেও তার মন পড়ে আছে একটা ব্যাপারে। কখন রাত হবে, পার্টির লোক আসবে টাকা দিতে। টাকাটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তার

শান্তি নাই। সন্ধ্যা থেকেই তার অস্বস্তি বেড়ে যায়, এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ায় খবর নিয়ে। পার্টির লোক আসছে কিনা নজর রাখে। সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন দলীয় লোক এসে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, একটা করে কাগজ দিয়ে গেছে, কিন্তু তাতে তার কোন উৎসাহ নাই। নতুন করে ভোট দিতে আর কি শেখাবে, ভোট দিয়ে দিয়ে তো বুড়ি হয়ে গেল। আর ভোটের ছাপ তো মনেই আছে। লোকগুলি গ্রামের প্রতিটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কাগজ দিয়ে আসে। কানিকুড়োর মাও তাদের সঙ্গে ঘোরে। কিন্তু আসল কথা তো কেউ একবারও বলছে না অথচ সাহস করে সে কথাটা জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না।

লোকগুলি চলে গেল। কানিকুড়োর মা আশা ভঙ্গে দারুন হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবল, পরে বোধহয় আবার কেউ আসবে টাকা নিয়ে, এই আশাতেই থাকল।

এখন অনেক রাত। এত রাতে আর কারো আসার সম্ভাবনা নাই জেনে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল। ভোট দেবার সব উৎসাহ তার মাঠে মারা গেল। রাতে শুয়েও ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়ে ভাবছে, এবারের ভোটটা কি তবে বিফলেই যাবে।

সকাল কখন হয়েছে বুঝতে পারে নাই। কানিকুড়োর মা এখনও বিছানায় শুয়ে আছে। ভোট দেবার সব উৎসাহ সে হারিয়ে ফেলেছে। পাড়ার মেয়েরা এখনও তাকে বাড়িতে থাকতে দেখে খুব অবাক হল। কানিকুড়োর মা যে এখনও ভোট দিতে যায়নি এটা দেখে তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

—'কি গো, কানিকুড়োর মা; ভোট দিতে যাবে না, শরীর খারাপ নাকি?'

—'না তো, শরীল ভালই আছে। দেখি খানিকবাদে যাব, ঘরের কাজকর্মগুলো তো সারতে হবে। আর আমার একটি ভুট না দিলেই বা কি এসে যায়। অনেক ভুট তো দিলাম, আমাদের অবস্থা তো যে কে সেই।'

কানিকুড়োর মায়ের এমন কথা শুনে প্রতিবেশীরা আবার একবার বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

———

১০ সাধুবাবা

কেউ বলে 'উচ্চিংড়ে', কেউ বলে 'বিছুটি'—। তা সে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে এসে হাজির, শুধু হুকুমের অপেক্ষা। যে কোন কাজ হোক ফটিক (ওরফে উচ্চিংড়ে, বিছুটি) তা করে দেবে। বয়স দশের বেশি নয়, রোগা লিকলিকে হাত-পা, পেট মোটা, মাথায় উসকো-খুসকো চুল। সব সময়েই সে ব্যস্ত কোন না কোন কাজে, আর তার সব কাজই যে অনুমোদনযোগ্য তাও নয়। কাজ অকাজ দুই-ই সে করে থাকে।

ফটিক বলে কেউ তাকে ডাকে না—বলে ফট্‌কে, আর তাতে তার কোন আপত্তিও নাই। উপর পাড়ার মোড়ল দাদু বলল—যা তো বাবা ফট্‌কে, পাশের গ্রামের নাপিতকে একটা খবর দিয়ে আয়। ফট্‌কে এক পায়ে রাজি 'এই এখুনি যাই' বলেই ছুট লাগায়। তার পছন্দের কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে থাকে পাশের গ্রামে যাওয়া, এটা পছন্দ করার যথেষ্ট কারণও আছে।

পাশের গ্রামে যেতে রাস্তায় পড়ে পতিঘোষের আমের বাগান, সেখানে আমগুলো বেশ বড় হয়েছে, আর আছে খামারবাড়ির জামের গাছ, যার দু-একটা ডাল প্রাচীরের বাইরে চলে এসেছে, কাল কুচকুচে জামগুলি তাকে সব সময় হাতছানি দেয়। সুতরাং পাশের গ্রামে যাবার আগে আমগাছে জামগাছে দুটো ঢিল মারবেই। আর তার হাতের যা টিপ তাতে দু-একটা কাঁচা আম, কয়েকটা পাকা জাম তো খসে পড়বেই।

সেই কোন ছোটবেলায় মা মারা গেছে, ফট্‌কের সে কথা মনেই পড়ে না আর এ নিয়ে তার মাথাব্যথাও নাই, সে থাকে নিজের খেয়ালে। বাবা জনমজুর খেটে যা পায় তাতে বাপ-বেটার চলে যায়।

ফট্‌কের বাবা সাধাসিধা মানুষ, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না, আর তার ছেলে যে এমন বিছুটি হবে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

একদিন তার বাবা বলল, 'বাবা ফটিক, আমার তো বয়স হল সবদিন কাজে যেতে পারি না, তা তুই যদি একটু কাজকর্ম করিস তো খুব ভাল হয়।'

কাজ করতে ফটিক একপায়ে রাজি। সে উৎসাহের সঙ্গে বলে—'কাজ করব, কি করতে হবে বল।'

বাবা বলে—'মোড়লদের একটা রাখাল দরকার, গরু-ছাগল-ভেড়া চড়াবার জন্য, তুই ঐ কাজে লেগে যা।'

সেই থেকে ফটিক মোড়লদের গরু চড়ায়। গরুর পাল নিয়ে কাঁদর পেরিয়ে চলে যায় জঙ্গলের ধারে। সঙ্গে থাকে গামছায় মুড়ি বাঁধা, সারাদিনের খাবার। বিকালে গরুর পাল নিয়ে ঘরে আসে। গরুগুলির ভর্তি পেট দেখে মোড়ল খুশি হয়। ফট্‌কেরও খাবারের বরাদ্দ বাড়ে।

কিন্তু ভালভাবে বেশি দিন থাকা ফট্‌কের ধাতে নাই, তার মাথায় বদ্‌মাইসির পোকাটা নড়ে ওঠে। একদিন দেখা গেল পালে একটি ছাগল কম। মোড়ল জিজ্ঞাসা করাতে ফট্‌কে কাঁদতে কাঁদতে বলে—'বনের ধারে পাল ছিল, একটা শেয়াল এসে ছাগলটা ধরে নিয়ে যায়, আমি ছুটে গিয়েও ছাড়াতে পারলাম না।'

মোড়ল কথাটা বিশ্বাস করল কারণ এমন ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটত। কিছুদিন পরে একটি ভেড়ার বাচ্চা খোয়া গেল, পরে আর একটি ছাগল। পরপর এই ঘটনায় মোড়লের সন্দেহ হয়। একদিন তাকে খুব চেপে ধরায় এবং দু-চার ঘা মার দেওয়ায় সে সব কবুল করে।

আসলে ছাগল ভেড়াগুলি মোটেই শিয়ালে ধরে নাই। সে নিজেই সেগুলি কয়েকটা টাকার বিনিময়ে একটা লোককে পাল থেকেই বেচে দিয়েছে।

তার এই স্বীকারোক্তিতে মোড়লের রাগ আরও বেড়ে যায়। একটা খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখে প্রহার চলে এবং তার বাবাকে ডেকে পাঠান হয়। তার বাবা হাতজোড় করে মোড়লের পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। অগত্যা ফট্‌কে ছাড়া পায়।

বারবার এমনি ছোটখাট অপরাধ করেছে গ্রামে, ধরা পড়েছে, মার খেয়েছে আবার ছাড়াও পেয়েছে। চুরি বিদ্যায় হাতেখড়িটা তার এমনি ভাবেই হয়েছে।

এখন ফটকের বয়স প্রায় কুড়ি বছর। হঠাৎ তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। এখন চুরিচামারির কথা আর সে তত ভাবে না। তার সঙ্গে ভাব হল পাড়ারই মেয়ে ময়নার। ময়নাকে নিয়ে সে বিয়ে করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। তার স্বপ্ন সফলও হয়। ময়নাকে সে বিয়ে করে।

এখন ফট্‌কে আর চুরি করে না, জনমজুর খেটে সংসার চালায়। কারণ সে বুঝেছিল চুরি করে ধরা পড়ে বেধড়ক মার খাওয়ার চেয়ে খেটেখাওয়া অনেক ভাল। ইতিমধ্যে তার বাবাও মারা যায়। কিন্তু হলে হবে কি, একবার যার বদনাম হয়েছে তা আর শত চেষ্টাতেও যায় না।

একরাত্রে মোড়ল বাড়িতে চুরি হয়। সিঁদ কেটে গয়না, বাসনকোসন, অনেক কিছুই চোরে নিয়ে যায়। আর কথায় আছে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। তাই গ্রামের সবার মত এই যে ফট্‌কেই চুরি করেছে। থানায় ডায়রি করা হল কিন্তু পুলিশ আসার আগেই ফট্‌কে সট্‌কে পড়ল। কেউ তার কোন হদিশ পেল না এমন কি তার স্ত্রীও জানত না সে কোথায় আছে। ফট্‌কে দেশান্তরী হল।

এরপর কেটে গেছে দশটি বছর। ফট্‌কের কথা গ্রামের লোক প্রয় ভুলেই গেল। ময়না তার বাবার কাছে ফিরে এল।

২.

গ্রামের একপাশে ছোট একটি কাঁদর। তার পাড়ে বিশাল একটি বটগাছ। একদিন রাত্রে গ্রামের লোকেরা দেখল বটতলায় ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। কৌতুহলী হয়ে কয়েকজন গিয়ে দেখল এক সাধুবাবা তার এক চেলাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আস্তানা গেড়েছেন।

সাধুর পরনে একটি লেংটি, সর্বাঙ্গে ছাইমাখা, মাথায় জটা মুখে দাড়ির জঙ্গল। বিরাট একটি ত্রিশুল সামনে পুঁতে রেখে ধুনী জ্বালিয়ে সাধুবাবা বসে আছেন।

গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা সাধুবাবাকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে। তার চেলার কাছ থেকে সব কিছু জানার চেষ্টা করে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় চেলাটি যে উত্তর দিল তা থেকে জানা গেল যে সাধুবাবা হিমালয় থেকে এসেছেন ভারতভ্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং চলতে চলতে এখানে এসে পৌঁচেছেন।

চেলাটি আরও জানায় যে সাধুবাবা সারাদিন মৌন থাকেন, কেবল রাত্রে কথা বলেন।

'তেরা নাম বসন্ত্?'—সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞাসা করে।

বসন্ত হকচকিয়ে যায় সাধুবাবার মুখে তার নাম শুনে।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবা'—বসন্ত গদগদ ভাবে জবাব দেয়।

'বাপ কা নাম রামচন্দর, পানি মে ডুবকে মারা গিয়া?'

'হ্যাঁ, বাবা'—কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দেয় বসন্ত।

'কিন্তু বাবা, আপনি কি করে জানলেন এতকথা'—বলে হাতজোড় করে সামনে বসে পড়ে বসন্ত।

'হাম সব কুছ্ জানতা হ্যায়, হামকো সব কুছ্ মালুম হ্যায়। যা বেটা ভগবান তেরা ভালা করে গা।'

বসন্ত এবং তার সঙ্গীসাথীরা সাধুবাবার এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে অবাক হয়। কথাটা আগুনের মত দ্রুত গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

সাধুবাবার এখন রমরমা বাজার। আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক মানুষ ছুটে আসে তাদের অনেক কথা জানতে।

আস্তে আস্তে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে একটি কুটির তৈরী হল সাধুবাবার থাকার জন্য। সাধুবাবা জাঁকিয়ে বসলেন।

কথাটা মোড়লের কানে গেল। তার বাড়িতেও খুব অশান্তি তার ছেলেকে নিয়ে।

'আয় বেটা, নজদিক আয়। তু ভোলা মোড়ল আছিস না? তোর বেটা তোকে খুব তন্ করছে?—সাধুবাবার অব্যর্থ নিশানা ভোলা মোড়লের বুকে গিয়ে আঘাত করল।

'তেরা ঘরমে কভি চুরি হুয়া থা?'

'হ্যাঁ বাবা হয়েছিল, অনেকদিন আগে।'

'তব, তুম বহোত গুনাহ্ কিয়া। এক ভালা আদমিকো তুম ফাঁসা দিয়া। বহোত পাপ লাগা। তুমকো ভুগতনা পড়েগা।'

সাধুবাবার সবকিছু বলে দেবার এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে মোড়ল কাঁদো কাঁদো গলায় হাতজোড় করে বলে—'হ্যাঁ বাবা, ভুল হয়েছিল, রাগের বশে একজন নির্দোষ লোকের নামে থানায় ডায়রি করেছিলাম। তবে সে মামলা খারিজ হয়ে গেছে। এখন আমার খুব আফশোস হয়।'

গলবস্ত্র হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মোড়ল তার পাপের প্রতিকারের উপায় জানতে চায়।

'সব ঠিক হো জায়েগা, লেকিন হামকে অমাবস্যামে যজ্ঞ করনা পড়ে গা। আউর কুছ্ খরচা ভি হোগা।'—সাধুবাবা টোপ ফেলে।

মোড়ল টোপ গেলে এবং খরচের জন্য পাঁচশ টাকা, চার আনা সোনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র এনে হাজির করে।

'লেকিন বেটা, এক বাত শোন, ইয়ে কাম করনেমে কমসে কম দো মাহিনা টাইম লাগেগা।'

মোড়ল তাতেই রাজি হয়। আর প্রতিদিন তার বাড়ি থেকে দুধ, ঘি, ফলমূল যায় সাধুবাবার সেবার জন্য।'

মোড়লের দেখাদেখি গ্রামের আরও অনেকে যায়। সাধুবাবাও তাদের সব ঘটনা ঠিকঠিক বলে দেয়। প্রতিকারের জন্য যথারীতি ফর্দ দেওয়া হয়। টাকা-পয়সা ভালই আমদানি হতে থাকে।

সবার দেখাদেখি ময়নাও একদিন হাজির হয় সাধুবাবার কাছে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খবরের আশায়।

ময়নাকে দেখে সাধুবাবা বিচলিত হয়ে পড়ে মনে মনে। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধ্যান করার পর বলে—'তেরা কাম আজ নেহি হোগা। তু কাল ফির আসবি, হামি তোর স্বামীর কথা সব বাতলে দেব।' ময়না ফিরে আসে।

পরদিন সাধুবাবা তার চেলাকে পাঠায় দূরের কোন গ্রামে যেখান থেকে একদিনের মধ্যে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা কম।

পরের দিন সন্ধ্যায় ময়না আবার আসে, আসে অন্যান্য দর্শনার্থীরাও সবাইকে বিদায় করে ময়নাকে গোপনে কিছু কথা বলে। ময়না বাড়ি ফিরে যায়।

সাধুবাবার আমদানি ভালই হচ্ছে এবং তার সবকিছু ময়নার হাত দিয়ে গোপনে পাচার হয় আর তা জমা থাকে ময়নার কাছেই। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য মোড়লের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আদায় করে।

ভক্তদেরকে দেওয়া দু'-মাস সময়ের আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি আছে। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে সেই নির্দিষ্ট দিনটির জন্য। সেই দিনই তারা পাবে সমস্ত অশান্তি দূর করার তাবিজ, কবচ, মাদুলি।

দিনের বেলায় সাধুবাবার কাছে লোক আসা বারণ ছিল। সন্ধ্যা হলেই সকলে দল বেঁধে হাজির হয় সাধুবাবার আশ্রমে। কুটিরের দরজা বন্ধ। ডাক দিয়ে সাধুবাবার সাধনার ব্যাঘাত ঘটাতে কেউ রাজি নয়। সবাই অপেক্ষা করে আছে। শেষে যখন অনেক রাত্রি পর্যন্ত কুটিরের দরজা খুলল না তখন একজন আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে দেখল পাখি উড়ে গেছে।

৩.

বহুদিন পর ফট্‌কে গ্রামে ফিরে এসেছে। এতদিন পরে তাকে অনেকেই চিনতে পারে নাই।

'পেন্নাম হই মোড়লমশাই, আজ্ঞে আমি আপনাদের ফট্‌কে—বিনয়ে গদগদ হয়ে ফট্‌কে মোড়লকে প্রণাম করে।

মোড়লের পুরোনো রাগটা জেগে ওঠে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে। বিশেষ করে সাধুবাবা উধাও হয়ে যাবার পর থেকে তার মনটা একেবারে খিঁচিয়ে ছিল। কারণ পাপ কাটানর জন্য বেশ মোটা টাকাই সে সাধুবাবাকে দিয়েছিল। মোড়ল কিছু না বলে দ্রুত প্রস্থান করে। ফট্‌কে মুচকি মুচকি হাসে।

রাতে বিছানায় শুয়ে ময়না ফট্‌কেকে জিজ্ঞাসা করে—'তোমার ভয় করত না?'

'ভয় কিসের? আমি তো ভুল কিছুই বলতাম না। বিশ বছর ধরে গ্রামে ছিলাম। সবার সব কিছুই তো আমার জানা ছিল।

আর তাছাড়া দিনের বেলা তো আমি বাইরে আসতাম না। রাতে একটি প্রদীপের মিটমিটে আলোয় কে আর আমাকে চিনতে পারবে এতদিন পরে'—ফট্‌কে হাসতে হাসতে বলে।

'তবে আমার বেশি রাগ ছিল ঐ মোড়লের ওপর। ওর জন্যই তো আমাকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি টাকা ওর কাছ থেকেই আদায় করেছি। আর মামলাটা যে আগেই খারিজ হয়ে গেছে তা জেনে নিয়েছিলাম'—কথাটা বলে একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করে ফট্‌কে।

ময়না আরও নিবিড়ভাবে ফট্‌কেকে জড়িয়ে ধরে বলে—'লোকের কার কি উপকার হয়েছে জানি না, তবে আমার দারুণ কাজ হয়েছে। সাধুবাবার দৌলতেই আমি স্বামীকে ফিরে পেয়েছি।'

ফট্‌কে ও ময়না দু'জনেই হো-হো করে হেসে ওঠে।

---

১১ ভালো লাগা ফিরে পাওয়া

ছেলের বাড়িতে যাওয়াটা ছিল নিছক সৌজন্যমূলক। মেয়ে আগে থেকেই পছন্দ করে রেখেছে তার জীবনসাথী এবং তার পছন্দের পর বাবা-মা আর এ ব্যাপারে দ্বিমত করেনি বরং মেয়ের পছন্দের তারিফ করেছেন অধ্যাপক সেন এবং মিসেস সেন, অবশ্য মেয়ের অনুপস্থিতিতে, তার সামনে নয়।

অধ্যাপক মনোময় সেন, স্ত্রী শ্যামলী এবং একমাত্র মেয়ে তনুশ্রী। কলকাতায় এক নামকরা কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন মনোময় সেন। মেয়ে কলেজে পড়ার সময় থেকেই আলাপ হয় অভিজিতের সঙ্গে। একই ক্লাসে পড়ত। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা এবং সেটাই খুব শীঘ্র পরিণয়ে পরিণতি লাভ করবে। অভিজিৎ ডাঃ সমরেন্দ্র ঘোষের একমাত্র সন্তান, এখন কলকাতায় একটি MNC-তে Top Executive, উচ্চ আয় ছাড়াও অঢেল সুযোগ-সুবিধা। সুতরাং এমন একটি ছেলেকে মনোনীত করে তনুশ্রী যে মোটেই ভুল করেনি সে কথা অধ্যাপক সেন ও তার স্ত্রী মনে করেন। আর মেয়ে বিয়ের পর কলকাতাতেই থাকতে পারবে এবং ভবিষ্যতে কোম্পানি থেকেই বিদেশে পাঠিয়ে দেবে।

বিকালের দিকে অধ্যাপক সেন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ ঘোষের বাড়িতে আসেন তাদের আমন্ত্রণেই। অবশ্য এর আগে অধ্যাপক সেন ও ডাঃ ঘোষের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল না। আজই প্রথম আলাপ-পরিচয়।

বিশাল সুসজ্জিত ড্রইংরুমে এসে বসেন। ডাঃ ঘোষই সাদর আহ্বান করে এখানে এনে বসান। বসার মিনিট খানেকের মধ্যে ডাঃ ঘোষের স্ত্রী নন্দিনী আসেন। অধ্যাপক সেন ডাঃ ঘোষের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ একটি কথায় তার সম্বিৎ ফেরে।

'স্যার, ভাল আছেন?'

শুনেই চমকে ওঠে প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় অধ্যাপক সেন।

'তুমি...তুমি, নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'আমি নন্দিনী, নন্দিনী ঘোষ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলতে হবে না, এবার মনে পড়েছে। What a pleasant surprise. তোমাকে যে এখানে দেখব ভাবতেই পারিনি।'

'তুমি অধ্যাপক সেনকে চেনো নাকি'—ডাঃ ঘোষ নন্দিনীকে শুধান।

'চিনব না, উনি তো আমার মাস্টারমশাই, কলেজে জুলজি পড়াতেন'—বলেই নন্দিনী এগিয়ে এসে অধ্যাপক সেনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

'থাক, থাক, আবার প্রণাম কেন'—অধ্যাপক একটু অস্বস্তিতে পড়ে।

'তাই কি হয় স্যার, আপনি আমার—' কথাটা শেষ করতে দেন না অধ্যাপক সেন। বাধা দিয়ে বলেন, 'এখন থেকে আর স্যারট্যার নয়, এবার তো আমরা বেয়াই-বেয়ান হতে চলেছি। কি বলেন ডাঃ ঘোষ'।

'অবশ্যই, অবশ্যই, এবার থেকে নতুন সম্পর্ক, নতুন সম্বোধন'—বলেই হো-হো করে দিলখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলেন ডাঃ ঘোষ।

'তবে একটা কথা বলি। আমি আপনি-টাপনি বলতে পারব না। তুমি বলেই সম্বোধন করব। কি মঞ্জুর তো?' —বলেই সম্মতির অপেক্ষায় নন্দিনীর দিকে তাকান অধ্যাপক সেন।

'ঠিক আছে স্যার, তাই হবে, তবে অভিজিৎ ও তনুশ্রীর বিয়ের পর থেকে।'

'বুঝলেন ডাঃ ঘোষ, তখন আমি সবেমাত্র কলেজে জয়েন করেছি। ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে গেছি। তখন বয়স বেশ কম, ছেলেমেয়েরা অল্পবয়সী অধ্যাপক দেখে একটু গোলমাল করছে, নানা রকম ভাসা-ভাসা মন্তব্যও কানে আসছে, আর লজ্জায় এবং কিছুটা ভয়ে আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তখন ক্লাসেরই একটি মেয়ে, নামটা মনে নেই, সে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাসের ছেলেদের ধমক দিতেই সবাই চুপ করে। তোমার মনে আছে নন্দিনী সেদিনের কথা।'

'হ্যাঁ, স্যার মনে আছে।'

'কি যেন নাম ছিল মেয়েটির?'

'কাকলি বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ কাকলি মনে পড়েছে এবার। সেই কাকলি, নন্দিনী এবং আর একটি মেয়ে—'

'বন্দনা—' নন্দিনী নামটা মনে করিয়ে দেয়।

'ইয়েস বন্দনা, এই তিনজনের নাম ছিল থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, নামটা আমিই দিয়েছিলাম। কারণ কলেজে তো বটেই বাইরেও এই তিনজনকে সবসময়

একসঙ্গে ঘুরতে দেখতাম। একা একা এদেরকে খুব কমই দেখা যেত। কি ঠিক বলছি তো নন্দিনী।'

হ্যাঁ স্যার, ঠিকই বলেছেন'—সায় দেয় নন্দিনী।

'অবশ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবার পর আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আর আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা হল। খুব ভাল লাগছে।'

এমনি করেই কথাবার্তা এগোচ্ছে। তারই ফাঁকে নন্দিনী চা-জলখাবার নিয়ে এল। খেতে খেতে নানা কথা হতে লাগল।

একটা ফোন এল। ডাঃ ঘোষ ফোন অ্যাটেন্ড করে এসে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—অধ্যাপক সেন, আমায় মাফ করবেন, আমাকে এক্ষুণি একবার বেরোতে হবে। নার্সিংহোমে একটি পেসেন্টের অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপের দিকে। কিছু মনে করবেন না।

'না, না, এতে মনে করার কি আছে, আপনি এক্ষুণি সেখানে যান। এটাই তো আপনার কর্তব্য'—অধ্যাপক সেন ব্যস্ত হয়ে ডাঃ ঘোষকে বলেন। ডাঃ ঘোষ চলে যাবার পর মিসেস সেন ও মিসেস ঘোষের মধ্যে ঘরোয়া কথাবার্তা শুরু হল।

মনোময়ের কথা—

অধ্যাপক সেন ধূমপানের অজুহাতে বাইরে বারান্দায় একটি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বাইরে তখন আঁধার নামতে শুরু করেছে। দূরের রাস্তার আলোগুলি টিমটিম করে জ্বলছে। একটি সিগারেট ধরিয়ে অধ্যাপক সেন ডুবে গেলেন অতীতের স্মৃতিমেদুরতায়।

আরাম কেদারায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সিগারেটে দু-একটা টান দিচ্ছেন আর চোখ বন্ধ করে স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছেন।

এম.এসসি পাশ করেই কলেজে চাকরি পান, বয়স সবেমাত্র চব্বিশ-পঁচিশ। চেহারাটা চোখে পড়ার মত। প্রাথমিক জড়তা কেটে যাবার পর ছাত্রমহলে পড়ানোর ব্যাপারে বেশ সুনাম হয়। আর এ ব্যাপারে তিনি নিজেও খুব সচেতন ছিলেন। রীতিমত পড়াশুনো করে তৈরী হয়ে ক্লাসে যেতেন এবং খুব দরদ দিয়ে পড়াতেন।

সেই সময় নন্দিনী ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। রংটা একটু ময়লা হলেও তার টানাটানা চোখ দুটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। গড়নটাও মন্দ নয়। খুব কম কথা বলত, বলতে গেলে খুব মনোযোগী ছাত্রী ছিল।

প্রথমদিন ক্লাসে নন্দিনীকে দেখেই খুব ভাল লেগে গেছিল মনোময়ের, বিশেষ করে তার ভাসাভাসা চোখ দু'টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করত।

সেই চোখ দুটির আকর্ষণই থেকে গেছে এখনও পর্যন্ত এবং আজ নন্দিনীকে দেখার পর থেকেই পুরনো ভালো লাগা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

ক্লাসে নন্দিনী বারবার জিজ্ঞাসা করত, বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। মনোময় যত্ন করে দেখিয়ে দিত বারবার। আর তারও ভাল লাগত নন্দিনীর সান্নিধ্যে বারবার যেতে।

কথায় কথায় একদিন দু-একজন সহকর্মীর কাছে নন্দিনীর সুন্দর চোখের প্রশংসা করে। ব্যস, তখন থেকেই বন্ধুমহলে হাসিঠাট্টা শুরু হয় ওদের দু'জনকে নিয়ে। তবে এসব সীমাবন্ধ থাকত মাত্র দু-তিনজন সহকর্মীর মধ্যে এবং তারাও এটাকে নিছক ঠাট্টা হিসাবেই মনে করত শুধু মনোময়ের পিছনে লাগার জন্য। এক নির্মল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মনোময় এসব নিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবত না, শুধু তার চোখ দুটি ভাল লেগেছিল, কোন ভালবাসা নয় ভালোলাগা মাত্র। না পাওয়ার বেদনা নাই, আঘাত নাই। সে তো নন্দিনীকে কোনদিন আপন করে পেতে চায়নি। আর সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সদ্য পিতৃহারা মনোময়ের পক্ষে ভালবাসার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল সেই সময়। তাদের সম্পর্কটা ছাত্রী-শিক্ষকের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল আর যেটুকু ভাললাগার ব্যাপার ছিল তা ছিল মনোময়ের একান্ত আপনার। এর বিন্দুবিসর্গ বহিঃপ্রকাশ হয়নি কোনদিন।

তিন বছর পর সেই থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স পাস করে বেরিয়ে গেল, আর কোন সম্পর্ক রইল না। কিন্তু মনোময়ের মনের মধ্যে একটি ভাললাগার ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে থেকে গেল।

পরবর্তীকালে এই ভাললাগার অনুভূতিটা সাংসারিক জীবনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিও করেনি। তবে মাঝেমাঝে অলস মুহূর্তে কখনও কখনও ভেসে উঠত সেই দুটি চোখ মনের পর্দায়।

আজ নন্দিনীকে দেখার পর থেকেই আবার সেই ভাললাগার অনুভূতিটা অনুভব করল, হারিয়ে যাওয়া অনেক স্মৃতি হঠাৎ ভিড় করে মনের মধ্যে এসে হাজির হল।

তবে এ বয়সে এ সবের কোন প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না, একটা তাৎক্ষণিক অনুভূতি বিজলিরেখার মত মনের আকাশপটটাকে চিরে দিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডাঃ ঘোষ ফিরে এলেন নার্সিংহোম থেকে। আবার শুরু হল আরেক প্রস্থ গল্প, আর এর মধ্যেই অভিজিৎ ও তনুশ্রীর বিয়ের দিনটাও পাকা হয়ে গেল।

নন্দিনী ভিতরে গেল আর একবার চায়ের ব্যবস্থা করতে। চা-টা নন্দিনী নিজেই তৈরী করে তার মনের মত করে।

নন্দিনীর কথা—

চায়ের জল চাপিয়ে টি-পট, কাপপ্লেট ঠিক করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নন্দিনী। ভাবে তার কলেজ জীবনের কথা। সেই এম.এস. স্যার, কতদিন পরে দেখা। তার ভাললাগার স্যার। স্যারের পড়ানো, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেওয়া সব কিছু মনে পড়ে। যেহেতু সে বারবার স্যারকে ডেকে আনত দেখিয়ে দেবার জন্য। এ নিয়ে থ্রি-মাস্কেটিয়ার্সের অন্য দু'জন তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, তবে তা থাকত ঐ তিনজনের মধ্যেই সীমাবন্ধ। চতুর্থজন আর কেউ জানত না। ওরা বলত, 'নন্দিনী, তুই গিয়ে স্যারকে ডেকে নিয়ে আয়, আমরা গেলে তো বকুনি খাব।'

কপট রাগে নন্দিনী তাদের পিঠে চাপড় মারত। সেই টুকরো-টুকরো ঘটনাগুলি আজ নতুন করে ভিড় জমাচ্ছে মনের আঙিনায়। তার মনেও মনোময়ের প্রতি ভাললাগার একটা অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেও ভালবাসার কথা ভাবেনি, তবে কাউকে ভাল লাগতে তো কোন দোষ নেই।

নিজের মনেই হাসে তখনকার ছেলেমানুষির কথা ভাবলে। কলেজ ছেড়ে আসার পরও অনেকদিন মনোময় স্যারের কথা তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছিল, তারপর তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

আজ এতদিন পর স্যারকে যে এভাবে এখানে দেখতে পাবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি নন্দিনী। স্যারকে তার বাড়িতে দেখে একটু লজ্জাও পেয়েছিল। তবে মনে মনে ভাবে, 'মরে গেলেও বেয়াইমশাই বলতে পারব না।'

একসঙ্গে সবাই মিলে চা-পর্ব সমাপ্ত করল। এবার বিদায় নেবার পালা। অধ্যাপক সেন ও মিসেস সেন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে বললেন—'আজকের দিনটা খুব ভাল কাটল, একটা হারান জিনিস বহুদিন পর খুঁজে পেয়ে খুব ভাল লাগল।'

ফিরতে ফিরতে চিন্তা করছিলেন, 'তনুশ্রী ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে। সে সুখী হোক। আর আমিও আমার পুরনো ভাললাগাকে ফিরে পেয়ে খুশি হলাম!'

১২ নেশা

জন্ম থেকে আংশিক প্রতিবন্ধী দুখু। বাঁ-হাতটা অনেকটা ছোট এবং দুর্বল, তেমন জোর নেই। বাঁ-পাটাও কিছুটা ছোট, তাই একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। জন্মের আগেই তার বাবা মারা যায়। ছোটবেলায় তাই কাকার সংসারেই মানুষ হয়েছে দুখু। আর আপনজন বলতে সংসারে ছিল কেবল বিধবা মা। রাজনগর থানার কুশাইপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। যেহেতু ছোটবেলা থেকেই সে রুগ্ন, তাই আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের মত সে ছোটাছুটি ও খেলাধুলো করতে পারত না। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যখন খেলত সে কেবল বসে বসে তাদের খেলা দেখত। কাকার সংসারে তার মাকে উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হত, তাই দুখুর উপর সব সময় নজর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত না। একটু বড় হতেই ভর্তি হল গ্রামের পাঠশালায়। লেখাপড়া করত নিজের খেয়ালেই, দেখিয়ে দেবার কেউ ছিল না। তাই এক-একটা ক্লাসে তার এক বছরের বেশি সময় লেগে যেত। সারাদিনের পর একমাত্র রাত্রে শোবার সময় সে মাকে কাছে পেত। বিছানায় শুয়ে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে অনেক কথা হত তার মায়ের সঙ্গে।

'তুই কবে বড় হবি দুখু, আমার দুঃখ একটু ঘুচবে'—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তার মা বলত দুখুকে বুকে চেপে ধরে। দুখু কিছু বলত না। শুধু মায়ের বুকের শব্দের মধ্যে এক অব্যক্ত চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেত।

দুখু শারীরিক ভাবে পুরো সুস্থ না থাকায় বাড়ির কাজকর্ম তেমন করতে পারত না তার ফলে জুটত নানা রকম গঞ্জনা। বাড়িতে ছিল একটা রেডিও। দুখু পড়াশুনা বাদ দিয়ে সব সময় রেডিওর কাছে বসে থাকত, যদিও তাতে হাত দেবার কোন অধিকার তার ছিল না। গান শুরু হলে দুখু হারিয়ে যেত এক অন্য জগতে। কোন হুঁশ থাকত না। কোন গান একবার শুনলেই তা অবিকল গেয়ে দিতে পারত। খুব ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তার আলাদা একটা টান ছিল। গলাটাও ছিল বেশ মিষ্টি ও সুরেলা। বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ার পর তার পড়াশুনায় ইতি। পাশ করতে পারে নাই। আর লেখাপড়া ছাড়ার পর তার সময় কাটানর একমাত্র উপায় গান। গানের উপর

তার অত্যধিক আসক্তির জন্যই শুরু হয় অশান্তি। বাড়ির কেউ তার এই সঙ্গীত চর্চাকে মেনে নিতে পারে নাই।

ভারী কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যান্য খুড়তুতো ভাইরা যখন মাঠে কাজ করত সে তাদের সঙ্গো থাকত কেবল ছোটখাট ফাইফরমাস খাটার জন্য, যেটা কারও পছন্দ হত না।

বাড়িতে থাকলে রেডিওতে গান শোনা আর বাইরে গেলে গান গাওয়া, এই ছিল তার সারাদিনের কাজ। তার সবচেয়ে পছন্দের গান ছিল বাউল ও লোকগীতি। বীরভূমের বিখ্যাত বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। তার গানের সুরে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে থাকত। রেডিও, মাইক ইত্যাদিতে তখন পূর্ণদাসের গানের ছড়াছড়ি। ছোটবেলা থেকেই এই বাউল গানই ছিল দুখুর ধ্যানজ্ঞান। ভাঙা টিনের কৌটা দিয়ে নিজেই তৈরী করেছিল একটি একতারা। আর সেটি নিয়েই তার সারাদিন সময় কেটে যেত। তার সব সময়ের সাক্ষী ছিল ঐ একতারাটি। নদীর ধারে, আমবাগানে, মাঠে-ঘাটে যখন যেখানে থাকত সেখানেই চলত তার সঙ্গীত চর্চা। কোন শিক্ষাগুরু তার ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর এবং নিজের চেষ্টাতেই সে গান গেয়ে যেত। শুনে শুনে গান মুখস্ত করে নিত, কিছু কিছু খাতায় লিখে রাখত তার অপটু হস্তাক্ষরে।

একটু বড় হতেই এ গ্রামে সে গ্রামে চলে যেত গানের আসরে গান শুনতে। এ জন্য বাড়িতে তাকে সহ্য করতে হত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, কিন্তু কোন কিছুই তাকে ফেরাতে পারে নাই গানের জগৎ থেকে। তার অকর্মণ্যতার জন্য মাকেও শুনতে হত অনেক কটুকথা। কিন্তু কিছু তার করার ছিল না, একমাত্র পুত্রটিই ছিল তার অবলম্বন এবং তার ভালমন্দের কথা চিন্তা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ।

সংসারের অত্যধিক পরিশ্রমে দুখুর মায়ের শরীর আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত হয় কঠিন পীড়ায়। বেশ কিছুদিন বিনা চিকিৎসায়, অনাদরে ও অবহেলায় রোগভোগ করে একদিন বিদায় নেয় সংসার থেকে। মায়ের মৃত্যুতে দুখু নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। এরপর থেকে দুখুর উপর নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে যায়, সে এখন তার কাকার সংসারে বোঝার মত।

কোন রকমে বছরখানেক এমনি করেই কাটায়। তারপর একদিন তার একতারাটি সম্বল করে দুখু বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে অজানা পথের সন্ধানে।

তখন তার বয়স পনের কি ষোল। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে জেলার সদর শহরে এবং তখন থেকেই শুরু হয় তার ভিক্ষাবৃত্তি। অবশ্য লোকের দরজায় দরজায় সে ভিক্ষা করতে যেত না, সে বেছে নিয়েছিল ট্রেনে ভিক্ষা করার পথটা। সাঁইথিয়া থেকে অন্ডাল অথবা সাঁইথিয়া থেকে বর্ধমান এই দুটি রেলপথেই চলত তার ভিক্ষা। যখন যেদিকে মন চাইত উঠে পড়ত ট্রেনে। সাঁইথিয়াতেই সে থাকতে শুরু করে। প্রথম প্রথম রেলের প্লাটফর্মেই সে রাত কাটাত। সকাল হলেই উঠে পড়ত ট্রেনে, একবার যাওয়া আর একবার ফিরে আসা। এতেই যা পয়সা পেত তাতেই তার ভালভাবেই চলে যেত। স্টেশনের পাশেই একটি হোটেল থেকে দুপুর ও রাতের খাবার খেয়ে নিত।

গানের গলাটা তার ভালই ছিল, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও সুরেলা হয়ে উঠেছিল। ট্রেনের যাত্রীরা তার গান শুনে খুশি হত, ফলে তার রোজগারও বাড়ত। এমনিভাবেই তার জীবন কাটছিল গান গেয়ে আর ভিক্ষা করে। বছর দুই এমনিভাবে কাটানর পর কিছু পয়সা জমাতে পেরেছিল আর তাই দিয়ে সে সামান্য এক টুকরো জমি কিনে সেখানে ছোট একটি মাটির ঘর তৈরী করে।

তার ছোটবেলা যত দুঃখকষ্টেই কাটুক না কেন একটি ব্যাপারে তার ভাগ্য খুব ভাল ছিল বলতে হয়। এমনি একদিন সে যথারীতি ট্রেনে গান করে ভিক্ষা করছে। সেদিন কি মনে করে প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় উঠে পড়ে। প্রথম শ্রেণীতে যাত্রীর সংখ্যা কম থাকে বলে সাধারণত সে প্রথম শ্রেণীতে উঠতে চাইত না। সেদিন একটি ফাঁকা সিটে বসে পরপর দু-তিনটে গান করে শুরু করে তার ভিক্ষা। একজনের কাছে হাত পাততেই তিনি তার নাম, ধাম ইত্যাদি জানতে চান। সব কিছু শুনে তিনি বলেন, 'তুমি রেডিওতে গান করতে চাও?' কথাটা শুনে নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না দুখু। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার সম্বিৎ ফিরে আসে। রেডিওতে গান করা তো তার একমাত্র স্বপ্ন। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—'আমাকে কে আর নিয়ে যাবে ওখানে। আর ওখানে কি আমার মত একজন ভিখারী গান করার সুযোগ পাবে?'

'কেন পাবে না? তোমার এত সুন্দর গলা, তুমি নিশ্চয়ই সুযোগ পাবে'—বেশ জোরের সঙ্গে ভদ্রলোক বলেন এবং একটি ভিজিটিং কার্ড দুখুর হাতে দিয়ে বলেন—'পারলে কলকাতা গিয়ে এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করো।'

দুখু কৃতজ্ঞচিত্তে কার্ডটি হাতে নিয়ে হাত দুটি কপালে ঠেকায়। বলাবাহুল্য ঐ ভদ্রলোক ছিলেন আকাশবাণীর সঙ্গীত বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি। আনন্দে এবং উত্তেজনায় সেদিন আর ভিক্ষা করে না দুখু। তার দীর্ঘদিনের আশা যে এমনিভাবে পূর্ণ হতে চলেছে সেটা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নামার আগে সেই ভদ্রলোককে বারবার নমস্কার করে পরের ট্রেনেই বাড়ি ফিরে এল।

ট্রেনে গান করার সুবাদে ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা তাকে ভালভাবেই চিনত এবং দুখুও তাদের অনেকের নামধাম জানত। তেমনি এক নিত্যযাত্রীর সহযোগিতায় একদিন সে হাজির হল কলকাতায় আকাশবাণীর স্টুডিওতে। সেখানে তার কণ্ঠস্বরের পরীক্ষায় ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয় এবং আকাশবাণীর একজন শিল্পী হিসাবে গান গাওয়ার সুযোগ পায়। অবশ্য তার আগে তার দুখু নামটা পাল্টে হয়েছে সুধাকর দাস বাউল। রেডিওতে গান গাওয়ার পর থেকে তার কদর অনেক বেড়ে যায়। তার গান শুনে লোকের ভালও লেগেছিল, বিশেষ করে তার কণ্ঠে একজন বিখ্যাত বাউলের কণ্ঠের আদল তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

এখন থেকে দুখু সুধাকর দাস বাউল। তবে ট্রেনে ভিক্ষা করাটা সে কোনদিনই ছাড়ে নাই, তার কারণ রেডিওতে গান করে যে পারিশ্রমিক পেত তাতে তার খরচ চলার কথা নয়। তাছাড়া রেডিওতে গান করার সুযোগ পাওয়া যেত অনেকদিন পরপর। তবুও রেডিও শিল্পী হিসাবে তার নাম হল। তখন থেকে সুধাকর আর ভিক্ষার জন্য সবার কাছে হাত পাতত না। বেছে বেছে বিশেষ করে জানাশোনা লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারা তাকে বসার জায়গা দিয়ে পরপর বেশ কয়েকটা গান শুনত এবং চারআনা, আটআনার বদলে দু-এক টাকা ভিক্ষা হিসাবে দিত। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য যাত্রীরাও যথাসম্ভব বেশি পয়সাই তাকে দিত। এতে একদিকে তার রোজগারও যেমন বাড়ত অন্যদিকে সমস্ত ট্রেন ঘুরে গান গাওয়ার পরিশ্রমটাও কমত।

রেডিও শিল্পী হিসাবে নাম হওয়ার পর ট্রেনেই অনেকে তার সাথে যোগাযোগ করত জলসায় গান করার জন্য, যে জলসা গুলি হত ছোট ছোট ক্লাবের বা কোন পারিবারিক পূজায়। প্রায়ই সে ডাক পেত এমনি জলসায়। দু-তিনজন সহকারী কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীকে নিয়ে সে ছোট একটা দল গঠন করে। জলসা না থাকলে যথারীতি ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা। গানের দল গড়ার পর থেকেই তার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন হতে শুরু করে। এতদিন পর্য্যন্ত সে কোন

রকম নেশা করত না কিন্তু রাত জেগে জলসায় গান করার ফলে এবং অন্যান্য সহযোগীদের পাল্লায় পড়ে সে গাঁজা খেতে ধরে। প্রথম প্রথম একটু-আধটু খেত, পরে সেটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। আর হাতে যখন পয়সা আসে তখন নেশা করার প্রবণতাও বোধহয় বৃদ্ধি পায়। এই গাঁজার নেশাই তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

সুধাকরের বয়স তখন প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। তারই মত এক বাউল ভিক্ষুকের মেয়ে বিমলাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধে। এখন থেকে সুধাকর পুরোপুরি একজন সংসারী মানুষ। নিয়মিত ভিক্ষায় যায়, জলসায় গান করে, বেশ সুখেই কাটতে থাকে তার দিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার গাঁজার নেশাটাও বাড়তে থাকে। বেশ কিছুদিন এমনি করে কাটল। সুধাকর দাস বাউলকে তখন অনেকেই চিনে গেছে। তার গানের চাহিদাও বেড়েছে। গাঁজা খাবার টানে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটল, তারা এসে গাঁজা খেত, গান শুনত। আড্ডা জমাত। এতে সুধাকরের মাসকাবারি খরচও অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু তখন তার দিলদরিয়া মেজাজ, খরচের তোয়াক্কা না করে যা রোজগার করত তার বেশির ভাগই খরচ করে ফেলত। এ নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে ছোটখাট অশান্তিও লেগে থাকত।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও নেশা করার ফলে মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ত সুধাকর আর তখন দিন এনে দিন খাওয়া সুধাকরের সংসারে অশান্তিও চরমে উঠত। সুস্থ হলে আবার ভিক্ষায় যেত কিন্তু আস্তে আস্তে তার গলার সুরেলা ভাব অনেকটাই কমে আসতে লাগল। বেশীক্ষণ সুর ধরে গান করতে পারত না। তার স্ত্রী এ ব্যাপারে তাকে অনেক আগেই সাবধান করেছিল, কিন্তু সুধাকর তা শোনে নাই। তার নেশার মাত্রা বাড়ল বৈ কমল না। আর খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম তো ছিলই। বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ভালভাবে আর গান গাইতে পারে না। গাইতে গেলেই জোর কাশির দমকে গান বন্ধ করে দিতে হত। ট্রেনে তার পরিচিত নিত্যযাত্রীরা প্রথম প্রথম সহানুভূতি দেখাত, গান না গাইলেও চার-আটআনা পয়সা দিত। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলবে। আর জলসার ডাকও তার বন্ধ হয়ে গেল। নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে তার দিন কাটতে থাকে।

দিন দিন সুধাকরের শরীরটা খারাপ হতে থাকে। সব সময় ঘুসঘুসে জ্বর আর সঙ্গে কাশি। কাশতে কাশতে কখনও কখনও মুখ থেকে রক্তও উঠতে থাকে। তবুও তার গাঁজা খাবার কমতি নাই আর এই অবস্থাতেই তাকে

ভিক্ষায় যেতে হয়। বাঁ-কাঁধে একতারা আর ডান কাঁধে সাইড ব্যাগটি ঝুলিয়ে ঐ অবস্থাতেও তাকে ট্রেনে উঠতে হয়। গান গাইতে পারে না, শুধু হাত পেতে ভিক্ষা চায়। তার মুখচেনা যারা ছিল এমন অবস্থায় তারাও মুখ ফিরিয়ে নিত। ভিক্ষা চেয়ে হাত পাতলে না দেখার ভান করে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার অন্য কারও কাছে হাত পাতে। রোজগার ভাল হয় না, দু'বেলা ভাল ভাবে খাবারও জোটে না। দারিদ্রের জ্বালায় সংসারেও অশান্তি চরমে উঠে। শরীরটা আরও খারাপ হতে থাকে, কয়েকদিন বাড়িতেই থাকল এবং যখন আর কোন উপায় থাকল না আবার চেষ্টা করল ট্রেনে যেতে।

কোনমতে অসুস্থ শরীরটাকে টানতে টানতে প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হল। আজ যেন তার শরীরের সব শক্তি উধাও হয়ে গেছে। ট্রেন এল, কোনরকমে দরজার হাতল ধরে টেনে তুলল শরীরটাকে। শুরু হল সাংঘাতিক কাশি, সঙ্গে রক্ত। কাশতে কাশতে দরজার কাছেই শুয়ে পড়ল মেঝের উপর। বসে থাকার ক্ষমতাটুকুও তখন তার ছিল না। সমস্ত শব্দ এবং আলো তার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে থাকল। কখন ট্রেন ছাড়ল, কোথায় এল কিছুই বোঝার মত জ্ঞান তার রইল না। অন্ডালে ট্রেন থামলে সবাই দেখল সুধাকর দাস বাউলের শেষ পরিণতি। তখন তার দেহে প্রাণ নাই। একতারাটা বুকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে সুধাকর দাস বাউল।

---

১৩ কেনারামের বাঞ্ছা পূরণ, ক্ষ্যান্তমণির মরণ

কেনারামের যেটুকু জমিজমা ছিল তার সবটাই বাঁধা পড়ে আছে মহাজন বলাই হালদারের কাছে। পাঁচ বছরের মধ্যে জমি ছাড়াতে না পারলে স্বত্ব ছাড়তে হবে। তবে বলাই হালদার তাকেই জমিটা চাষ করতে দিয়েছে উৎপন্ন ফসলের সিকি ভাগ দিয়ে।

কেনারাম দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছে আর ভাবছে ভবিষ্যতের কথা। কোন কিছুই তার মাথাতে আসছে না দেখে তার বৌকে ডাকল—অ বউ শুনছিস, এখানে একটু আয় তো, তোর সাথে একটা শলা আছে।

কেনারামের বউ ক্ষ্যান্তমণি তখন গুল দিয়ে দাঁত মাজছিল, কথা বলার মত অবস্থায় ছিল না। তাড়াতাড়ি পুকুরে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে বলল, বল কি বলছিলে।

—তু তো জানিস, এ বছর জমিটা ছাড়াতে না পারলে তো হাতছাড়া হয়ে যাবে তখন উপোস দিয়ে মরতে হবে। কিছু একটা উপায় বার কর দিকি।

—তা, আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি বলব, উ যা করার তুমিই কর বাপু।

—তু একবার মহাজনের হাতে-পায়ে ধরে বলে দেখ না যদি কিছু হয়।

—আ মলো যা, ঐ বলাই হালদারের কাছে আমি মেয়ে মানুষ হয়ে যাব? তুমি জান না ওর স্বভাব চরিত্তির কথা?

কেনারাম কেন, গ্রামের সবাই জানে বলাই হালদারের স্বভাব চরিত্রের কথা। লোকে আড়ালে তাকে কষাই হালদার বলে ডাকে। পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক বলাই হালদার জীবন রসিক পর নারীর প্রতি তার আকর্ষণ সর্বজনবিদিত। তাই স্বামীর মুখে বলাই হালদারের কথা শুনে একটু অবাকই হয়েছিল ক্ষ্যান্তমণি।

—তা, তুমিই, আর একবার হাতে-পায়ে ধরে বল, যদি কিছু করে তো তোমার কথাতেই করবে।

'হবে না, হবে না, আমার কথাতে কাজ হবে না'—স্বগতোক্তি করে কেনারাম।

কেনারাম জানে যে বলাই হালদার তাকে দেখতেই পারে না। তার এই পোড়া কাঠের মত চেহারাটা নিয়ে তার কাছে দাঁড়ালে দূর, দূর করে তাড়িয়ে দেবে। অনন্যোপায় হয়ে আবার সে ক্ষ্যান্তমণিকে অনুরোধ করে।

ক্ষ্যান্তমণি অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবল। সে ভাবল কেনারামের কথা। লোকটা চাষ করে যা পায় তাতে দু-বেলা ভালভাবে পেট ভরে না, তার উপর জমিটা কেড়ে নিলে তো নির্ঘাৎ উপোস। তাই কেনারামের অসুবিধার কথা ভেবে সে ইচ্ছা না থাকলেও যেতে রাজি হল বলাই হালদারের কাছে।

—তুমি যখন অ্যাতো করে বলছ তখন যাব একবার, তবে তুমিও আমার সঙ্গে যেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তা না হলে আমার খুব ভয় করবে।

ক্ষ্যান্তমণির বয়স চল্লিশের নিচেই। নিঃসন্তান বলে শরীরের বাঁধুনি যুবতী মেয়েদেরও লজ্জা দেয়। রংটা একটু ফর্সার দিকেই। একমাথা চুল ঘাড়ের উপর খোঁপা করে বাঁধা থাকে। তার চাল-চলন চোখের চাউনি আর পাঁচটা মেয়ের থেকে একটু আলাদা। তবে সে যাই হোক গ্রামের কেউ তার চরিত্রের কোন দোষ দিতে পারবে না। এদিক থেকে সে খুব সাচ্চা ছিল।

কেনারামের ইয়ার বন্ধুরা রসিকতা করে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান করত, 'এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

কেনারাম কিছু বুঝতে পারে না, গান শুনে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ক্ষ্যান্তমণিকে বলাই হালদারের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বাইরে গাছতলায় বসে একটা বিড়ি ধরায় কেনারাম। বুকটা ভয়ে দুরদুর করছে। বলাই হালদার যদি রাজি না হয় তবে সে কি করে খাওয়াবে ক্ষ্যান্তমণিকে। কেনারাম খুব ভালবাসে ক্ষ্যান্তমণিকে, আর বাড়িতে তৃতীয় কোন প্রাণী না থাকায় তারা পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছে। কেনারামের চেহারাটা কাঠখোট্টা হলেও ক্ষ্যান্তমণিকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ক্ষ্যান্তমণি বাইরে এলো বেশ হাসি হাসি মুখে। কেনারাম তাকে দেখে ভরসা পেল।

ক্ষ্যান্তমণি রফা করেছে বলাই হালদারের সঙ্গে। জমিটা আরও দু'বছর কেনারাম চাষ করবে এবং এবার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক সে পাবে। শুনে কেনারাম হাঁফ ছেড়ে বলে-তু আমাকে বাঁচালি বউ।

—তবে বাপু একটা কথা বলি, মহাজন বলেছে যে তার ঘরের কাজকর্ম একবেলা করে দিয়ে আসতে হবে।

—তা দিবি করে, আমাদের ঘরে তো বেশি কাজ নাই। কেনারাম খুশি হয়ে বলে।

কেনারাম নূতন উদ্যমে চাষের কাজ শুরু করে। ক্ষ্যান্তমণিও যায় একবেলা করে বলাই হালদারের বাড়িতে কাজ করতে। তবে দু'দিনের মধ্যে বুঝতে পারে বলাই হালদারের আসল মতলবটা। তার বাড়িতে কাজের লোকের কোন অভাব নাই, তবুও ক্ষ্যান্তমণিকে দেখার পর আরও একজন কাজের লোক রাখতে রাজি হয় বলাই হালদার। সবাই জানে যে বলাই হালদারের খপ্পড়ে একবার পড়লে আর রেহাই নাই, অক্টোপাশের মত সে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরবে। তার হাত থেকে শিকার ফসকে পালাবে এমন শিকারী বলাই হালদার নয়। ক্ষ্যান্তমণির অবস্থাও তাই হল। সে না পারে এই নোংরামি সহ্য করতে, না পারে জাল কেটে বেড়িয়ে আসতে। সে জানত এ অবস্থায় কেনারাম ও তার মুখের ভাত জোটাতে এছাড়া আর গত্যন্তর নাই। বিশেষ করে কেনারামের কথা ভেবেই এই নোংরামি তাকে মেনে নিতে হয়েছে। সে নিজে একবেলা শাকপাতা সেদ্ধ করে খেয়ে থাকতে পারবে কিন্তু কেনারামের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

বলাই হালদারের বাড়ি থেকে আসার পর ঘণ্টা খানেক ধরে পুকুরে স্নান করে ক্ষ্যান্তমণি। তার ক্লেদাক্ত শরীরটা যেন কোন মতেই শুচি হয় না। বার বার থু-থু করে থুথু ফেলে। সদাচঞ্চল ক্ষ্যান্তমণির চালচলনে পরিবর্তন আসে, সে নিজেকে যেন আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয় নিজের মধ্যে, কথা কম বলে, বাড়ির কাজ করতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ে। একটা পাপবোধ তাকে সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে তার দিন কাটে।

কেনারাম সারাদিন মাঠে কাজ করে। ক্ষ্যান্তমণির মনের অবস্থা সে বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না তার পরিবর্তন, আর ক্ষ্যান্তমণি?

স্বামীর মুখ চেয়েই তাকে এই রাস্তা বেছে নিতে হয়েছে। সে ভাবে, লোকে তাকে কি বলবে—সতী না অসতী?

---

১৪ মিতা

সারাদিন শহরে রিকশা চালিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে মদন। রেল লাইনের পাশ দিয়ে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আসে। জড়ানো গলায় বেসুরো হিন্দি গান। ভোরবেলায় বেরিয়ে যায় মদন। মালিকের কাছ থেকে জমার রিকশা নেয়। রিকশায় ঠেকে এসে দাঁড়ায়। ততক্ষণে একটি চায়ের গুমটি দোকান খুলে যায়। চা বিস্কুট খেয়ে শুরু করে সারাদিনের কাজ। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রিকশা চালিয়ে, রিকশা জমা দিয়ে বাড়ি ফেরে। সারাদিনের খাওয়া দোকানেই সেরে নেয়। রোজগার ভালই হয়। ফেরার সময় রাস্তার পাশে গুমটি থেকে কিনে নেয় এক বোতল বাংলা মদ, সঙ্গে নেয় তেলেভাজা, চানাচুর আর মুড়ি। বোতলটা হাতে পেয়ে চক্‌চক্‌ করে ওঠে চোখ দুটো, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। আর তর সয় না মদনের। দোকানের পাশে বসে বোতল খুলে খানিকটা গলায় ঢালে, সঙ্গে থাকে চপ বা চানাচুর। একটু নেশা জমলে টলতে টলতে বাড়ির রাস্তা ধরে। তবে সারাদিন মদন মদ স্পর্শ করে না।

বাড়িতে একমাত্র লোক তার বউ মেনকা। কোন কোন দিন নিয়ে আসে মুরগির ছাল, নাড়ি ভুড়ি অথবা মাংসের ছাট। এগুলি যেদিন আসে সেদিন মেনকার কাজ বেড়ে যায়। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে মদের চাট বানাতে শুরু করে। কারণ হাত মুখ ধুয়ে মদন বসে পড়বে বোতল নিয়ে যতক্ষণ না তা শেষ হয়। কোন কোন দিন মদের আসরে ডাক পড়ে তার বাল্যবন্ধু ভূষণের।

ভূষণ প্রতিদিন মদ খায় না, তবে বন্ধুর ডাক পেলে তা উপেক্ষা করতে পারে না, এসে যোগ দেয়। আর মদনের বাড়িতে আসার একটা আলাদা টানও অনুভব করে এবং বলাই বাহুল্য সে টানটা মেনকার জন্য। দু-এক কাপ খাবার পর ভূষণ আর নেয় না, তবে মদনের চলতে থাকে যতক্ষণ না বোতল খালি হয়।

এই সময় দু'জনের মধ্যে অনেক কথাই হয়। বর্তমানের কথা, ছেলেবেলার কথা আরও কত কি! কথা বলতে বলতে তারা পৌঁছে যায় ছেলেবেলার দিনগুলিতে।

ভূষণের বাবার কয়েক বিঘা জমি ছিল। বাড়িতে খাওয়া পড়ার কোন অভাব ছিল না। ছোটবেলায় বেশ নাদুস নুদুস চেহারা ছিল ভূষণের, এখনও

তেমনি আছে, তবে একটু ভীতু প্রকৃতির। মদনের বাবা ছিল দিনমজুর। জনখেটেই সংসার চলত। তবে পরে বিঘাখানেক জমির প্লাট্টা পেয়ে চাষ করত অন্য সময় দিন মজুরের কাজ। কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে দিন গুজরান হত। ছোটবেলা থেকেই মদন ছিল খুব দুরন্ত আর খেয়ালী। তার প্রাণশক্তি ছিল অফুরান এবং এখনও তার চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ ও পেটান।

ছেলেবেলায় অনেক কথাই তাদের মনে পড়ে। দু'জনেই ভর্তি হয়েছিল পাশের গ্রামের স্কুলে। প্রায় দু'মাইল আল পথ ধরে হেঁটে যেতে হত। মাঝে পড়ত ছোট একটা কাঁদর। বছরের অন্যান্য সময় কাঁদরে জল থাকত না। তবে বর্ষার সময় দুকুল ছাপিয়ে বান আসত, তা থাকত দু-এক ঘণ্টার মত তবে সেই সময় স্রোত থাকত বেশ জোরালো এবং বিপজ্জনক। বাঁশের খুঁটি পুঁতে পারাপারের জন্য একটা সাঁকো বানিয়ে নিয়েছিল গ্রামের লোকেরা।

একদিন বর্ষায় স্কুলে যাবার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, নদী ছাপিয়ে বানের জল বইতে থাকে। নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে পার হতে যায় ভূষণ ও মদন। মদন অনেকটা এগিয়ে গেছে। অসাবধানতায় ভূষণ পা পিছলে পড়ে যায় খরস্রোতের মধ্যে। মদন সময়মত না দেখতে পেলে ভূষণের নির্ঘাত মৃত্যু হত। ভূষণ জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যায়। সে সাঁতার জানত না। মুহূর্তের মধ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে মদন জলে ঝাঁপ দেয় এবং কোনক্রমে ভূষণকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।

এরপর থেকে ভূষণের বাড়িতে মদনের খাতির খুব বেড়ে যায়। ভূষণের বাবা-মার মন মদনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। আর ওদের দুজনের বন্ধুত্বও আরও দৃঢ় হয়। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ ধরমতলায় গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিতা পাতিয়ে আসে। কথায় কথায় কখনও বোতল শেষ হয়ে গেছে। মদনের তখন আর বসে থাকার মত অবস্থা নাই। তালাইয়ের একপাশে ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়েছে। এখন সে ঘুমে অচেতন। ভূষণ মিতেনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি যায়। ততক্ষণে মেনকার রান্না হয়ে গেছে। অনেক ঠেলাঠেলির পর মদন উঠে বসে, কোন রকমে দুটি মুখে দেয়। অর্ধেক খাবার পড়েই থাকে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি ও মদের নেশায় সারারাত মদনের কোন হুঁশ থাকে না। ঘুম ভাঙে ভোরবেলায়, আর বেরিয়ে পড়ে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে।

ছোটবেলায় মদনের মা মারা যায়। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। স্কুলের পড়া মদনের কোনদিন ভাল লাগত না। কিছুদিন যাওয়া আসা করে পড়া ছেড়ে দিল। তার দেখাদেখি ভূষণও পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দেয়। মদনের

বয়স যখন ১৪/১৫ বছর, তার বাবা মারা গেল। কিছুদিন পর তার সৎ মা অন্য পুরুষের ঘর করতে চলে গেল। মদন একেবারে একা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পাশের গ্রামে ভূষণের বিয়ে হয়ে গেছে। তার বউ দিপালী বেশ মোটাসোটা অল্পবয়সী মেয়ে।

রোজগারের ধান্দায় মদন শহরে যেতে শুরু করল। কিছুদিন এটা ওটা করার পর শেষে রিক্সা চালানোর কাজ ধরে। হাতে নগদ পয়সা আসতে শুরু হল। শুরু হল মদ খাওয়া। আর এখন তো সে রীতিমতো মাতাল।

তার অত্যধিক মদ খাওয়া দেখে ভূষণও তাকে অনেকবার নিষেধ করেছিল। কিন্তু মদ ছাড়ার কথা বাদ দিয়ে অন্য সব কথা শুনতে সে রাজি ছিল। মদনের মদ খাওয়া উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

মদনের এই অতিরিক্ত মদ খাওয়া আর বাউণ্ডুলে স্বভাব দেখে ভূষণের বাবা মা চিন্তিত হয় এবং ঠিক করে মদনের বিয়ে দিয়ে তাকে থিতু করে দেবে, এতে যদি তার মদের নেশাটা একটু কমে। কথামতো মেয়ে দেখা শুরু হল এবং ভূষণের শ্বশুর বাড়ির গ্রামেই পাওয়া যায় মেনকাকে। বেশ প্রাণচঞ্চল কিশোরী, দেখতে শুনতে ভাল, শরীর স্বাস্থ্যও বেশ মজবুত। মেয়েটি গ্রাম সম্পর্কে ভূষণকে জামাইদা বলে ডাকে এবং শ্যালিকা হবার সুবাদে তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টাও করে। মদনকে মেয়ে দেখানো হল, পছন্দ হল এবং মেনকার সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল।

মেনকার শ্বশুরবাড়িতে স্বামী মদন ছাড়া আর কেউ ছিল না, তাই স্বাধীন ভাবে মনের মত করে তার সংসার পাতল। মদনের রোজগারও মন্দ ছিল না। মেনকা সংসারের হাল ধরায় তাদের কোন অভাবও রইল না। বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগল।

ছোট সংসারে কাজের তেমন চাপ নাই, শুধু রান্না আর বাড়ির টুকিটাকি কাজ। তবে বসে থাকার মেয়ে নয় মেনকা, সব সময় কোন না কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে আর অবসর সময়ে একবার করে ভূষণের বাড়ি যায় দীপালিকে দেখতে। দীপালি গ্রাম সম্পর্কে তার দিদি হলেও মেনকা এখন তাকে মিতেনী বলে ডাকে। দীপালিও এতে সায় দেয়।

ইতিমধ্যে ভূষণের তিনটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। তিনটি ছেলেমেয়ে সামলাতে দীপালি হিমসিম খায়। মেনকা তাকে কাজে কিছুটা সাহায্য করে।

দেখতে দেখতে দুতিন বছর কেটে গেল। মেনকার শরীরে এখন ভরা যৌবনের জোয়ার। সবসময় উচ্ছ্বল ও প্রাণবন্ত। মেনকা এলে ভূষণেরও খুব ভালো লাগে। মিতেনীর সঙ্গে হাসি ঠাট্টাও হয়।

মদন তার রোজগার বাড়াতে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মদ খাওয়া মেনকা যা কোনদিন মেনে নিতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও মদ খাওয়া কমাতে পারেনি মদনের। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতো কথা বলা বন্ধ থাকত দু'একদিন। মদন কথা দিত নেশা কম করার এবং মেনকার রাগ ভাঙানোর জন্য এনে দিত অনেক উপহার। কিন্তু কথা রাখতে পারত না। দু'চার দিন কম হলে আবার মদ্যপান বেড়ে যেত।

যখন থেকে মদন বাড়িতে মদ এনে খাওয়া শুরু করে তখন থেকেই তার মদ খাওয়ার পরিমাণও বেড়ে যায়। আর খাওয়ার পর সারা রাত তার মরণ ঘুম। অনেক চেষ্টা করেও বিছানায় মেনকা তার ঘুম ভাঙাতে পারত না। মেনকা রাগ করত, কষ্ট পেত, কিন্তু তার কিছু করারও ছিল না। এমনিতে মদন খুব ভালবাসত মেনকাকে।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না মেনকার। বাইরে বর্ষার রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি। শন্‌শন্ করে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে বাঁশের ঝাড়গুলি। মেনকার শরীরে কিসের যেন একটা শিরশিরানী। একটা সাপ যেন তার সারা শরীরে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরে এত বৃষ্টি কিন্তু তার ভিতরটা জ্বলছে। মন চাইছে কিছু পেতে। পাশে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে মদন। মেনকা তার বুকের কাপড়টা সরিয়ে মদনকে চেপে ধরে। অনেক চেষ্টা করে মদনের ঘুম ভাঙাবার। মদনকে জাগান যায় না। ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে কি সব বলে মেনকার দিকে পিছন করে পাশ ফিরে শোয়।

মদনের এই নিষ্ক্রিয়তায় মেনকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক ধাক্কায় মদনকে অনেকটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে বারান্দায় এসে বসে। ভেতরের জ্বালাটা কোনমতেই ঠাণ্ডা হতে চায় না। অনেকক্ষণ বসে রইল, বৃষ্টির ঝাপটায় সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। তারপর সেখানেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তা নিজেই জানে না।

ভূষণের সংসারে খুব বাড়বাড়ন্ত। বিয়ের পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই চারটি সন্তানের জনক। তবে পঞ্চম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে দীপালির প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। শেষে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে কোনমতে প্রাণরক্ষা হয় দীপালির। এরপর থেকেই তার শরীর একদম ভেঙে যায়। এখন তার কঙ্কালসার চেহারা, চোখ দুটি কোটরাগত, মাথার চুল অর্ধেক উঠে গেছে। চলাফেরা করতে পারে না, গত দু-তিনমাস থেকে তার শুয়েই দিন কাটে। দীপালির কথা মত তার দেড় বছরের কন্যা সন্তাটিকে মেনকার বাড়িতে দিতে যায় ভূষণ। মেনকা দীপালির বাড়ির কিছু কিছু কাজকর্ম করা ছাড়াও তার

কোলের মেয়েটিকে সামলায়। ভূষণ মেয়েটিকে মেনকার কাছে দিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে মদনের অনুপস্থিতিতে।

মিতেনীর কোলে সন্তানকে তুলে দেবার সময় সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। জড়িয়ে ধরে মেনকাকে। দুজনের মাঝখানে দেড় বছরের মেয়েটি হাঁকপাঁক করে ওঠে। মেনকা বাধা দেয়, কিন্তু সে বাধা যে খুব আন্তরিক নয় তা বুঝতে বাকি থাকে না ভূষণের। দুজনের মনের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছে। দুয়ে দুয়ে চার হতে সময় লাগে না। ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় দু'জনে।

এরপর থেকে দীপালিকে আর কিছু বলতে হয় না। ভূষণ নিজেই নিয়ে আসে তার ছোট মেয়েটিকে মেনকার কাছে যখন তখন।

এক নতুন নেশায় মেতেছে ভূষণ ও মেনকা। যে অবৈধ প্রেমের খেলায় তারা মেতেছে সেখান থেকে ফেরা অসম্ভব। এক অতলস্পর্শী গহ্বরের ঢাল বেয়ে তারা নামতে শুরু করেছে নিচের দিকে, শত চেষ্টাতেও সেখান থেকে ফিরে আসার উপায় নাই।

গভীর রাতে দরজায় মৃদু শব্দ হয়। মেনকা জেগেই থাকে। খুব সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দেয়। পাশের ঘরে নিয়ে যায় ভূষণকে। বিছানায় পড়ে থাকে ঘুমে অচেতন মদন। সারা রাত পাশের ঘরে ভূষণের সঙ্গে কাটিয়ে ঠিক সময় মতো নিজের বিছানায় এসে শোয় মেনকা। এই নতুন লুকোচুরি খেলাটা শুরু হয়েছে কিছুদিন থেকে। মেনকার মেজাজটাও এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে। তবে মদনের সেবা যত্নের কোন ত্রুটি রাখে না মেনকা। এখন ভোরে মদন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেনকাও উঠে চা তৈরী করে দেয়। তার এই অতিরিক্ত সেবাযত্ন তবে কি নিজের অপরাধকে ঢাকার জন্য?

মেনকার কাছে ভূষণের আসা যাওয়াটা অনেক বেড়ে যায়। যখন তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাজির হয় মেনকার কাছে, গল্প করে। বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে যায় মেনকার সান্নিধ্যে। তবে ব্যাপারটা পাড়া-পড়শিদের অজানা থাকে না। হঠাৎ ভূষণের এই আনাগোনা দেখে অনেকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মেনকার সঙ্গে ভূষণের অবৈধ সম্পর্কের কথা কিছু কিছু জানতে পারে। গ্রামের লোকের কাছে বিশেষ করে মহিলা মহলে এইটুকু খবরই যথেষ্ট। পাঁচ কান হতে দেরী হয় না। গ্রামে এখন এটা একটা গোপন আলোচনার বিষয়।

এমনি করেই কথাটা একদিন মদনের কানে যায় গ্রামেরই আরও দু'-একজন রিকশা চালকের মাধ্যমে। মদন প্রথমে খবরটায় তেমন আমল দেয় নাই। তবে ধারণা ছিল মিতা এমন কাজ কোনদিনই করতে পারে না এটা

শুধুমাত্র দুষ্ট লোকের রটনা মাত্র। লোকে চায় তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাক। সহজ সরল মদনের এটাই ছিল প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু সত্য বেশি দিন গোপন থাকে না। তাই বারবার একই কথা শুনতে শুনতে তার মনেও সন্দেহের বীজ দানা বাঁধতে থাকে। সে এই ব্যাপারে ভূষণ বা মেনকাকে কোন কথাই বলে না, শুধু মনে মনে তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে।

অন্যান্য দিনের মত আজও মদন সন্ধ্যায় ফিরে আসে, তবে আজ একটি নয় দুটি মদের বোতল নিয়ে এসেছে। দুটি মদের বোতল দেখে মেনকা মনে মনে খুশি হয়। মেনকা ভাবে আজ মদনের খাওয়ার কোন সীমা থাকবে না। সন্ধ্যা থেকেই শুরু করে দেয় মদন। রাত্রে খাবার আগে পর্য্যন্ত একটা বোতল শেষ করে ফেলে। প্রতিদিনের মত মেনকা তাকে কোন রকমে হলে দুটি খাইয়ে বিছানায় পৌঁছে দেয়। মদন ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় কোন হুঁশ থাকে না।

গভীর রাতে দরজায় টোকা পড়ে। মেনকা অন্যান্য দিনের মত সাবধানে ভূষণকে বাড়িতে ঢুকিয়ে নেয়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। পাশের ঘর থেকে অস্ফুট শব্দ ভেসে আসে। মদন কান খাড়া করে শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সব চুপচাপ হয়ে যায়।

মদনের মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে। রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে সে নিজেকে সংযত রাখে। সন্ধ্যা থেকে জল ভর্তি বোতল নিয়ে মদ্যপানের অভিনয়, বিছানায় গভীর ঘুমের অভিনয় সব কিছু ঠিকঠাক করে গেছে। কিন্তু আর সহ্য করতে পারে না। খুব সাবধানে পাশের ঘরের দরজার শিকলটা তুলে দিয়ে শিশি থেকে কেরোসিন তেল ঘরের চালে ছিঁটিয়ে দেয় এবং এক মুহূর্তে দেরী না করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে।

নিমেষের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আসল মদের বোতলটা হাতে নিয়ে মদন রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তার ভিতরের আগুনটা নিভে যায়।

লোকজন জেগে ওঠার আগেই ঘর দুটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মদের বোতলটা পুরো গলায় ঢেলে দেয় মদন। ভেতরটা আগুনের মত জ্বলে ওঠে। প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় বোতলটা পাথরের উপরে আছড়ে ভেঙে ফেলে। বিকৃত কণ্ঠে এক জান্তব চিৎকার বেরিয়ে আসে মুখ থেকে—শালা বেইমান, শয়তান, বিশ্বাসঘাতক।

---

১৫ মুদ্দাফরাস

'আজও কুনু খপর পেলে না'—দমকা কাশির বেগটা সামলে কোন রকমে কথাটা জিজ্ঞাসা করে বাসন্তী তার স্বামী ভোলাকে। কয়েকদিন ধরেই ধুম জ্বর বাসন্তীর, সঙ্গে কাশি। কয়েকটা ছেঁড়া কাঁথা চাপিয়ে শুয়ে আছে ঘরের এক কোণে। ঘর বলতে রেলের মাঠের একপাশে ছিটেবেড়ার ঘর, উপরে পলিথিনের ছাউনি।

'নাহ্, শালার মানুষগুলান খুব বেইমান হঁয়ে গেইছে এখুন'—চুল্লুর নেশায় ঝিমোতে ঝিমোতে জবাব দেয় ভোলা।

'তা'লে আজও ভাত খাওয়া হ'বে না'—হতাশ হয়ে বাসন্তী বলে।

'আজ আমার গরম ভাত খেতে খুব মন চাইছে, কবে থেকে ভাল করে ভাত খাই নাই'— আপন মনেই বলে যায় বাসন্তী।

তবে ঘরে ভাতের হাঁড়ি চড়ুক বা নাই চড়ুক, চুল্লুর জোগানটা ঠিক রাখতেই হয়। দিনের পর দিন না খেয়ে চলবে, কিন্তু চুল্লু ছাড়া এক বেলাও চলে না ভোলার। সেও জানে যে আজ ভাতের হাঁড়ি চড়বে না, তাই বোতলে যেটুকু চুল্লু ছিল তাই নিয়েই সকাল থেকে বসে পড়েছে।

'এখুন মানুষ মানুষের ভাল দেখতে পারে না, কেউ কারও উবগারও করতে চায় না। টেরেনের সামনে ঝাঁপ দেবার মত বুকের পাটা আর ক'জনের আছে। এখন মরছে হয় গলায় ফাঁস দিয়ে আর না হয় বিষ খেয়ে'—আপন মনে গজগজ করতে থাকে ভোলা।

ঘরের ভিতর বাসন্তী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ভোলার কথাগুলি তার কানে যায় না। ভোলা আপন মনেই বলে যায়—'গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মরতে তো খুব কষ্ট, যতক্ষণ না পেরানটা বেরয় হাঁকুপাঁকু করতে হয়, আর বিষ খেলে, সে তো আরও যন্ত্রণা, মুখে গ্যাঁজলা বেরোবে, বুক জ্বলে পুড়ে যাবে, ছটফট করতে হবে মিত্যু যন্ত্রণায়। তবুও শালার মানুষগুলান ঐ পথেই যাবে। কেনে বাবা, একবার শুধু জয় মা কালি বলে এস্‌পেরেস্‌ টেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পর, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ। জ্বালা যন্ত্রণা নাই, কষ্ট নাই, শরীলটা নিমেষের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাবে। কে শুনছে আমার কথা।'

ভোলা ডোম ও তার পরিবারের সবাই মুদ্দাফরাস। রেলে কাটা মৃতদেহ সরানর কাজ করে। পাহাড়পুর থেকে বড় বাঁধ, এই ১২০ কিলোমিটার রেলপথের কোথাও মানুষ কাটা পড়লে তা সরানোর কাজ ভোলা ডোমের। সেই একমাত্র ডোম যে এই কাজ করে।

সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের হাত ধরে এসে ডেরা বাঁধে রেল স্টেশনের গায়ে রেলের ফাঁকা জায়গায়। আদি বাড়ি ছিল সাঁওতাল পরগণায় এক অখ্যাত গ্রামে। সাতকুড়ি তখন খুব একটা বড় জায়গা ছিল না। রেলের যে জায়গায় তার বাবা ঝুপড়ি বানায় তা ছিল ঝোপজঙ্গলে ভরা, রাজ্যের যত ভবঘুরে আর ভিখারিদের আস্তানা। ভবঘুরের একটি দল বছরের পর বছর সেখানে থাকত। এই ডোমের কাজে কিভাবে বহাল হল তা ভোলার মনে পড়ে না। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই দেখত, ট্রেনে কোন মানুষ কাটা পড়লে তার বাবা যেত সেই ছিন্নভিন্ন দেহটা আনতে। বস্তায় জড়িয়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে আসত তার বাবা ও মা। লাশ জমা হত সাতকুড়ির রেল পুলিশের থানায়। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হত রামপুর হাসপাতালে পোস্টমর্টেমের জন্য। ছোটবেলা থেকেই ভোলা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যেত, আর একটু বড় হওয়ার পর থেকে বাবাকে তার কাজে সাহায্য করত। তখন তার মায়ের আর যাবার দরকার হত না। এই লাশ তুলে আনার জন্য তারা রেল কোম্পানির কাছ থেকে লাশ পিছু কিছু টাকা পেত। এভাবেই চলত তাদের সংসার। লাশ পেলে খুব খুশি হত, ক'দিন ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া চলত।

ক্রমে ভোলা জোয়ান হল, বিয়ে করল, তার বাবা-মা দু'জনেই মারা গেল। এখন সংসারে ভোলার বউ বাসন্তী আর দু'ছেলে রঘু ও কানু। পরিবারের সবাই এই কাজে নিয়োজিত। তাদের এই মুদ্দাফরাস কাজের জন্য কোন লোক তাদেরকে কাজে লাগাত না। তবে নর্দমা, পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজে কখনও কখনও ডাক পড়ত। তাতে রোজগারও বেশি হত না ফলে ভালভাবে দু'বেলা খাবারও জুটত না। কিন্তু পেটে ভাত থাকুক বা নাই থাকুক চুল্লুর জোগান ঠিক থাকত।

দীর্ঘদিন থাকার ফলে ভোলা ও তার ছেলেদের সবাই চেনে। কেউ যদি চুল্লু খেতে নিষেধ করত তখন ভোলা বলত—'চুল্লু নাখেলে কি সাদা চোখে এই কাজ করা যায় বাবু। দলাপাকানো খণ্ড খণ্ড শরীলটা তুলে বস্তায় মুড়ে নিয়ে আসা কি আর চাড্ডিখানি কথা। তাই চুল্লু খেতে হয়, আর খেতে খেতে এমন হয়েছে যে ভাত না খেলেও চলবে কিন্তু চুল্ল না খেলে জানে মরে যাব।'

মাঝে মাঝে এমন কাজের চাপ আসত যে একটা লাশ সাফাই করতে না করতে আরেকটা খবর আসত। খাবার সময় থাকত না তাদের। আর সেই কটা দিন চলত তাদের মহোৎসব। দিশি মদের দোকান থেকে বোতল বোতল মদ আসত, মাংস ভাত রান্না হত। একটা উৎসবের মেজাজ এসে যেত তাদের মধ্যে। ভোলা ও তার পরিবার কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত—'জয় মা কালি, তুমি কিরপা করো মা, এমনি করেই যেন আমদানি হতে থাকে।'

রেলে যারা কাটা পড়ত তাদের মধ্যে কিছু লোক অসাবধানে রেললাইন পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ত আবার কেউ কেউ ঝগড়া করে এসে আত্মহত্যা করত রেলে মাথা দিয়ে।

সাতকুড়ি স্টেশন পেরিয়েই একটি বাঁক, জায়গাটা সমতল, ঘন গাছপালায় ঢাকা, পাশে বড় পুকুর, নির্জন জায়গা। আত্মহত্যা করার জন্য অনেকেই এই নিরিবিলি জায়গাটা বেছে নিত। ভোলার মতে এই জায়গাটা তার খুব পয়মন্ত। ফি বছর দু-একটা লাশ এখানে হবেই হবে। অভ্যাসের বশে ভোলা মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে চলে আসত এই জায়গায়, যদি কপাল জোরে কিছু মিলে যায়।

এই কাজ করার ফলে ভোলার মন থেকে মায়া-মমতা ইত্যাদি অনুভূতিগুলি বোধহয় লোপ পেয়েছিল। দুর্ঘটনার পর মৃতের পরিবার যখন শোকে কাতর হয়ে পড়ত, ভোলা থাকত নির্বিকার, সে মনে মনে খুশিই হত, হিসাব করত, বেশ ক'দিন বসে বসে খেতে পাবে।

এখন ভোলার বেশ বয়স হয়েছে। অনাহারে, অর্ধাহারে আর চুল্লু খেয়ে খেয়ে শরীরটা ভেঙে গেছে। সোজা হয়ে চলতেও পারে না। দিনের বেশির ভাগ সময় বসে থাকে রেল পুলিশের থানার কাছে, যদি কোন খবর আসে এই আশায়। রেল পুলিশরা বলে—'কি ভোলানাথ, আজও কিছু হল না।'

'না, বাবু, মানুষ আর মরতে চাইছে না, সবাই শালা বেঁচে থাকতে চায়। কি যে দিনকাল এলো বাবু, সংসার চালানই দায় হয়েছে এখন'—রেল পুলিশেরা তার কথা শুনে মুচকি হাসে। 'আগে দেখেছি জোড়ায় ছেলেমেয়ে টেনের সামনে ঝাঁপ দিত বাবা-মায়ের উপর রাগ করে। এখুন সে দিন নাই। এখুন ভালবাসা হলে নিজেরাই বিয়ে করে লিছে বাবা-মায়ের অমতে, মরতে যাবে কুন দুখে'—নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে যায় ভোলা।

সন্ধ্যাবেলায় ডেরায় ফিরে আসে বিফল মনোরথ হয়ে। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করে—'কুন খপর পেলে?'

বাসন্তীর জ্বরটা দিন দিন বাড়ছে। আজ প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল তার জ্বর আর কাশির বিরাম নাই। ছেলে দুটি অন্যান্য কাজ করে যা রোজগার করে তাতে ভোলার চুল্লুর খরচ জুগিয়ে দু'বেলা ভরপেট খাবার জোটে না। এর মধ্যে যদি কোন খবর আসে, ভোলার চোখ দুটি আনন্দে চক্‌চক্ করে ওঠে। বৃদ্ধ ন্যুব্জ্য দেহটাকে টানটান করে বেড়িয়ে পরে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এখন ভোলা আর লাশ বইতে পারে না, এ কাজ করে তার দুই ছেলে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে লাশ বয়ে এনে হাজির হয় কাছাকাছি স্টেশনে এবং পরের ট্রেনে হাজির হয় সাতকুড়ি রেল পুলিশের থানায়। দুটো দিন বেশ ভাল ভাবেই চলে, আবার সেই প্রতীক্ষা।

নেশা জড়ান চোখে ঢুলতে ঢুলতে আপন মনেই অনেক কথা শোনায় বাসন্তীকে।

'আগে এই বর্ষাকালে অনেক কাজ হত। বিষ্টি বাদলের রাতে রাগ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত টেরেনের সামনে, কেউ জানতেও পারত না'—ভোলা তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের কথা বলতে থাকে।

'এখুন হয়েছে ঐ শালার ফলিডল না কি, এক বোতল মুখে ঢেলে দিয়ে ঘরের মধ্যেই মরে পড়ে থাকছে, কে আর কষ্ট করে এসে টেরেনের সামনে ঝাঁপাবে। আর না হয় একগাছি দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়ছে কড়ি কাঠে'—বিরক্তিতে গজগজ করতে থাকে ভোলা।

বাসন্তী শুয়ে শুয়ে সব কিছু শোনে। নিজেদের দুরবস্থার কথা ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—'ভগমানের বিচের নাই।'

ভোলা অনেক আবেদন নিবেদন করেছে রেলের উপরওয়ালাদের কাছে, বিশেষ করে যখন তারা স্টেশন পরিদর্শনে আসতেন, তার সামান্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করার জন্য। অনেকবার বলেও কিছু হয় নাই। আজও তাই তাকে বসে থাকতে হয় একটি দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যার প্রতীক্ষায়।

পুরোদমে বর্ষা নেমেছে। সব সময় আকাশের মেঘ ভার, ঝিমঝিম করে সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে। মাথার উপর পলিথিনটা শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে জলের ধারা বইছে। অসুস্থ বাসন্তীর লেপকাঁথা ভিজে একশা। ঐ অবস্থাতেই এক পাশে পড়ে আছে বাসন্তী। ছেলে দুটি গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে প্লাটফর্মের ওয়েটিং রুমে। শুধু ভোলা আছে বাসন্তীর কাছে। গায়ে বৃষ্টির জল পড়ছে টুপটুপ্ করে, ভোলা ঘুমে অচেতন।

বাসন্তীর জ্বর বেড়েছে, ঘুমও আসছে না। সে বুঝতে পারছে যে তার অসুখ আর সারবে না। একে অনাহার তায় চিকিৎসার অভাব, কেমন করেই বা সারবে অসুখ। অনেক কিছু চিন্তা করে বাসন্তী। তার তো কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই আর কোনদিন সে সেরে উঠবে তাও আশা করে না। শুধু শুধু কেন আর বেঁচে থাকা। মরে গেলে একটা পেটের খরচও তো কম হবে। এমনি হাজার চিন্তার জাল বুনে যায় মনে মনে।

তার চেয়ে যদি—আর কিছু ভাবতে পারে না বাসন্তী। অসুস্থ শরীরটাকে কোন মতে আস্তে আস্তে টেনে তোলে। ওপাশে ভোলা গভীর ঘুমে অচেতন। বাসন্তী ভাবে তার মৃত্যুর কথা। তবে যদি মরতেই হয় তবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কষ্ট করে মরে লাভ কি? তার চেয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়, তাতেও তো কয়েকটা টাকা আসবে। স্বামী ও ছেলেরা তো দুটো দিন ভালভাবে খেতে পাবে।

ভাবতে ভাবতে বাইরে এসে দাঁড়ায় বাসন্তী। শরীরটাকে কোনমতে টানতে টানতে চলতে শুরু করে রেললাইনের দিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। রাস্তায় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় বাসন্তী। জোরে একটি বজ্রপাতের শব্দ হয়, আলোর ঝল্‌কানিতে চারিদিক ভরে যায়।

১৬ আশা নিরাশা

সকাল থেকে ঠায় একভাবে বসে থাকে বিরজু। এটাই তার প্রতিদিনের রুটিন। সকালে উঠানে রোদ নামলেই একটা চাটাই পেতে বসিয়ে দিয়ে যায় তার বউ কমলা। পাশে রেখে যায় একটা শানকিতে কিছুটা শুকনো মুড়ি আর এক ঘটি জল। কমলা চলে যায় কাছের শহরে ঠিকে ঝি-এর কাজ করতে। বিরজুর চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই, শরীরের নিচের দিকটা অবশ, পা দুটো অসাড়, কোনক্রমে হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে সরাতে পারে।

সকালের রোদ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। বিরজু কিছুটা মুড়ি খায়, জল খায়, একটা বিড়ি ধরায়। সব সময় বসে থাকার ক্ষমতাও থাকে না, চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে।

শীতের সকাল, চারদিক রুক্ষ, জোরে হাওয়া বইলে ধুলো ছাই উড়ে এসে জমতে থাকে বিরজুর সর্বাঙ্গে।

মুরগীগুলো হুটোপটি করতে করতে ধুলো উড়িয়ে তার কাছে এসে পড়ে। হাতের লাঠিটা নিয়ে তাড়ায় আর অশ্রাব্য খিস্তি-খেউর করে।

বিরজুর এই শারীরিক অবস্থা তার জন্মগত নয়। সে ছিল সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম। রাজমিস্ত্রির কাজ করত এবং এ তল্লাটে তার নামডাকও খুব ছিল। অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসত। রোজগার মন্দ হত না, আর রোজগারের বেশির ভাগটাই খরচ হয়ে যেত তার খাওয়া-দাওয়ায় আর শৌখিনতায়।

শৌখিন হিসাবে তার নাম ছিল। কাজে যাবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রং-বেরং-এর পোশাক পরে রওনা হত। সঙ্গে থাকত তার নিত্যসঙ্গী রেডিও আর থাকত টিফিন ক্যারিয়ারে দুপুরের খাবার। ভোর থাকতে উঠে কমলা গরম গরম রান্না করে দিত। সারা দিনেব কাজ শেষে ঘরে ফিরত। সঙ্গে সাইকেলে লাগান থাকত তরিতরকারি, লেড়ো বিস্কুট বা কোন-কোনদিন চপ-বেগুনি-ফুলুরি।

মাটির ঘর হলেও মেঝেগুলি সিমেন্টে বাঁধান। বউকে খুব ভালবাসত। বেশ সুখেই ছিল তারা শুধু একটাই মাত্র দুঃখ তারা নিঃসন্তান। স্ত্রী কমলা স্বাস্থ্যবতী, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, গায়ের রং ময়লা হলেও শরীরের গঠন নজর

কাড়ার মত। বেশ সুখেই কাটছিল তাদের দিন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধহয় ছিল একটু অন্যরকম।

দুপুর নাগাদ কাজ থেকে ফিরে আসে কমলা সঙ্গে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে। এসে দেখে বিরজু চাটাইয়ের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে, সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরা।

কমলা বিরজুকে ডেকে তোলে। ঘুম ভাঙতেই তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠে—'আমার কি খিদে পায় না। হারামজাদির এতক্ষণে ফেরার সময় হল', —অকারণে গাল দিতে থাকে কমলাকে।

আজকাল এটাই হয়েছে তার স্বভাব। মেজাজটা দিনদিন রুক্ষ হয়ে উঠছে। শরীরটা যত খারাপ হচ্ছে, তার মেজাজের পারদও তত চড়ছে। তবে কমলার এটা সহ্য হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে বিরজুকে তুলে বসায়। শহর থেকে আনা বাবুদের বাড়ির খাবার কিছুটা ধরে দেয় তার সামনে।

গোগ্রাসে গিলতে থাকে বিরজু। তার জঠরে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, ইচ্ছা করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকেই যেন গিলে খেয়ে ফেলে। খাওয়া শেষ করে সকালের আধখাওয়া বিড়িটা ধরিয়ে চোখ বন্ধ করে বেশ আরাম করে সুখটান দেয়।

খাবার পর বিরজুর মনটা শান্ত হয়, দু-একা কথা বলে কমলার সঙ্গে। কমলা রান্নার ব্যবস্থা করে।

'আজ কি রান্না করবি কমলা'—বেশ উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিরজু।

'একদিন বাজার থেকে মুরগীর মাংস নিয়ে আসিস। কিছু ছাঁট মাংস, নাড়িভুড়ি, ঠ্যাং, ছাল চামড়া। কতদিন খাইনি, খেতে খুব ইচ্ছে করে'—বিরজু লোলুপের মত বলে কমলাকে।

'সে আনব একদিন, বেতন পেলে'—নিস্পৃহকণ্ঠে কমলা জবাব দেয়। জবাব শুনে বিরজু চুপ করে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার তার চোখে ঘুম নেমে আসে।

বিরজুর শারীরিক অবস্থা যাই হোক না মানসিকভাবে সে এখনও সুস্থ, মস্তিষ্ক সচল ও সক্রিয়। চিন্তাশক্তি এখনও স্বাভাবিক। তাই অলস কর্মহীন অথর্ব শরীর সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার আগের কথা, তার বাবা, ঠাকুরদার কথা।

ঠাকুরদা দুমকা জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে থাকত, জাতিতে ব্রাহ্মণ হওয়ায় তার বাড়তি খাতির ছিল গ্রামে। পালাপার্বণে পূজা আচ্চায় ডাক পড়ত। সমাজে তাদের আলাদা কদর ছিল। তার বাবা ছিল পিতামাতার একমাত্র

সন্তান। কিন্তু নিম্নজাতির একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে বাধ্য হয়ে তাকে গৃহত্যাগ করতে হয় তার ভালবাসার মর্যাদা রাখতে। মেয়েটিকে নিয়ে চলে আসে কয়লাখনি অঞ্চলে আসানসোলে। সেখানে রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ নেয় এবং সংসার পাতে।

কিছুদিনের মধ্যে তার বাবাও একজন দক্ষ রাজমিস্ত্রি হয়ে ওঠে। এরপর বিরজুর জন্ম হয়।

বিরজুর ছেলেবেলা কেটেছে কয়লাখনি অঞ্চলেই। তার বয়স যখন দশ কি বারো তখন একইদিনে তার বাবা ও মা মারা যায় এক অজানা রোগে। বিরজু একেবারে অনাথ হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। এখানে সেখানে রোজ খেটে কোন রকমে বেঁচে থাকে। সেও কাজ নেয় রাজমিস্ত্রির জোগানদারের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখতে থাকে একটু একটু করে, কারণ এই কাজটা ছিল তার রক্তে। অল্পদিনের মধ্যে রাজমিস্ত্রি হিসাবে তার নাম হয়। এমনিভাবেই দিন কাটতে থাকে।

শেষে পাণ্ডবেশ্বরে এসে সে থিতু হয়। একখণ্ড জমি কিনে ছিটেবেড়ার একটি ঘর তোলে শহরের একপ্রান্তে। আর এই কাজের সুবাদেই তার পরিচয় হয় কমলার সঙ্গে।

'নাও, ওঠ, চান করে নাও, রান্না হয়ে গেছে—কমলা জানান দেয়। বিরজুর চিন্তায় বাধা পড়ে। কোন রকমে শরীরটাকে টেনে তুলে উঠে বসে। কমলা এক খাবলা তেল এনে গায়ে মাথায় মাখিয়ে দেয়, এক বালতি জল এনে মাথায় ঢেলে দেয়। স্নান সারা হয়। উঠোনেই তার সারাদিনের থাকা ও খাওয়া।

খাবার পর ভাতঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। আরাম করে একটা বিড়ি ধরায়, বিড়ি শেষ হতে না হতেই চোখে ঘুম নেমে আসে। কমলা একটা চাদর এনে ঢাকা দিয়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ ঘুমনোর পর বিকাল হয়ে আসে, কমলা বিরজুকে ধরে এনে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দেয়।

শীতের বিকাল ক্ষণস্থায়ী, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমে আসে। বিরজুর সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা, কখন রাত হবে, আবার দুটি ভাত খেয়ে বিছানার তলায় আশ্রয় নেবে। তার তো আর কোন কাজ নেই। কেবল কোন রকমে বেঁচে থাকা-খাওয়া আর ঘুমান আর মাঝে মাঝে পুরনো স্মৃতির পাতা ওল্টান।

তখনও কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। কমলা জোগানদারের কাজ নিয়ে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কাজ করে। প্রথম দিন থেকেই কমলাকে বিরজুর নজরে ধরেছিল। কমলার শরীরের গঠন, তার চটুল চালচলন বিরজুকে আকৃষ্ট

করেছিল। তাই মাথায় ইটের বোঝা নিয়ে ভারাবেয়ে ওঠার কাছ থেকে রেহাই পেল। বিরজু তাকে মাচার উপরে নিজের কাছে কাজে লাগিয়ে দিল। তাতে একদিকে যেমন কমলার কাজের লাঘব হল তেমনি বিরজুও সব সময় তাকে কাছে কাছে পেল। কমলার সঙ্গে হাসি-মশকরা ও চটুল কথাবার্তা চলে।

কমলাকে এই বাড়তি সুযোগ দেওয়াটা অন্যান্য কুলি-কামিনরা ভাল চোখে দেখত না। কারণ শুধু একজনই প্রতিদিন হালকা কাজ পাবে এটা তাদের মনঃপুত ছিল না কিন্তু কিছু বলারও তো উপায় নেই, কারণ বিরজু হেডমিস্ত্রি এবং তার উপরে কারও কোন কথা চলত না। সুতরাং কমলা সুযোগটা পেয়েই যেত।

কাজ শেষ হবার পর বিরজু ও কমলা একসঙ্গে রওনা দিত। রাস্তার পাশে দোকানে চা-পাউরুটি-চপ খেত দু'জনে। কখনও কখনও বিরজু কমলাকে ছোটখাট উপহার কিনে দিত। তারপর সন্ধ্যার আগে কমলাকে তার বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে বিরজু বাড়ি ফিরত।

এমনি করেই বিরজু ও কমলার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে যা শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে পরিণতি লাভ করে।

কমলাকে বিয়ে করে ঘরে আনে বিরজু আর তখন থেকে তার কাজে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়।

'চা এনেছি'—একটু জোরেই কমলা বলে। বিরজুর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়। চায়ে চুমুক দিয়ে আবার একটা বিড়ি ধরায়। কমলা রাতের রান্নার জোগাড় করে।

বিরজু দু-একটা কথা বলতে চায় কমলার সঙ্গে, কিন্তু বিরজুর সঙ্গে কথা বলতে কমলার তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। পাঁচ কথার পর একটার জবাব দেয়, ছাড়াছাড়া ভাবে। বিরজুও একসময় কথা বন্ধ করে বসে বসে ঝিমোতে থাকে।

রাতের খাবার শেষ করে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ে, কোন কথা হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যে বিরজুর হালকা নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে কমলা, তার চোখে ঘুম নেই। নানা চিন্তায় তার মনটা ঘুরে বেড়ায়, মনটা কেবলই বিদ্রোহ করতে চায়। কিভাবে কাটবে তার বাকি জীবন, তার এই ভরা যৌবনটাকে কেমন ভাবে বঞ্চিত করে রাখবে। একটা মায়া পড়ে গেছে বিরজুর উপর। একটা দিন এমন ছিল যখন বিরজু তাকে খুব সুখে রেখেছিল কোন কিছুরই অভাব রাখেনি। শাড়ি, ব্লাউজ, আলতা, তেল, সাবান না চাইতেই এনে হাজির করত। সিনেমা দেখা, মেলা

দেখা তো লেগেই ছিল। রানির হালে রেখেছিল বিরজু কমলাকে। কমলাও সেই সুখের দিনগুলির কথা ভোলেনি, তাই আজও সে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে অসুস্থ বিরজুর সেবা শুশ্রূষা করে। আর এটাও জানে সে যদি না করে তা হলে বিরজু না খেয়ে মারা যাবে। জমান টাকা-পয়সাও নেই আর বিরজুর আপনজন বলতেও আর কেউ নেই। তাই ঝি-গিরি করে সামান্য যা কিছু টাকা-পয়সা ও খাবার পায় তাতেই কোনমতে চালিয়ে নেয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যেতে চায়, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কখনও ভাবে, কি দরকার নিজেকে এমনভাবে কষ্ট দিয়ে বঞ্চিত করে একটা অসুস্থ লোকের জন্য পড়ে থাকার। বিরজুর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। সে ছেড়ে চলে যাবে বিরজুকে। আবার পরক্ষণেই মনের রাশ টেনে ধরে, নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয়। তার বিবেক ও বিচারবুদ্ধি বিপরীত চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে আনে। কিন্তু কতদিনই বা এমনভাবে চলবে? পাশের বিছানায় একটা জড়বৎ মানুষ অসাড়ে ঘুমোচ্ছে, অথচ ঐ মানুষটাই যখন সুস্থ ছিল তখন কোন কিছুরই অভাব রাখেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করে এবং এক সময় দু'চোখে ঘুম নেমে আসে, সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় বিরজুর। কমলার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, আবার তার মনটা চলে যায় পিছন দিকে সেই সুখের দিনগুলিতে।

খুব বেশি সুখ বোধহয় কারও কারও সহ্য হয় না, যেমন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। একদিন কাজ করতে করতে অসাবধানতাবশত সে তিনতলা উঁচু বাড়ির মাচা থেকে পড়ে যায়। কোমর ও শিরদাঁড়া মারাত্মকভাবে জখম হয়। তিনমাস যমে-মানুষে টানাটানি চলে এবং হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পায় তখন তার চলাফেরার ক্ষমতা নাই, উঠে দাঁড়ানর ক্ষমতা নেই। যেহেতু মাথায় তেমন মারাত্মক চোট পায়নি তাই তার বিচার-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি আগের মতই আছে। জমানো টাকা পয়সা যা ছিল তা সব চিকিৎসায় শেষ হয়ে যায় যদিও বাড়ির মালিক তার খরচের অনেকটাই বহন করেছিল।

তারপর থেকেই বিরজু, পঙ্গু, অথর্ব, অক্ষম। কমলা তখন তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল—আমি তো আছি, আমি তোমাকে গতর খাটিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

সেইভাবেই চলছে, জোগানদারের কাজ নিলে হয়তো অনেক বেশি পয়সা রোজকার করতে পারত কিন্তু বিরজু তাকে সে কাজে যেতে দেয়নি। আর

কমলাও মাচার উপর উঠে ঐ কাজ করতে চায়নি। তাই ঝি এর কাজ নিয়ে কোনরকমে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছে।

কমলার প্রতি বিরজুর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কারণ সে জানে কমলা যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় তাতে তার করার কিছু নেই। এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে।

কিন্তু এখনও কমলা তাকে ছেড়ে যায়নি, তবে ইদানীং কমলার ব্যবহারে আগের মতো আর আন্তরিকতার ছোঁয়া পায় না। ভাবনাটাকে বিরজু মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ভাবে এটা তার মিথ্যা ভয়, কমলা তাকে ছেড়ে বোধহয় কোনদিন কোথাও যাবে না। ভাবতে ভাবতে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।

আবার সকাল হয়। সূর্য ওঠে। বিরজুর দিনও একইভাবে শুরু হয়। কমলা আজ কাজে যাবার আগে বিরজুর খাবার জন্য মুড়ি ছাড়াও রাতের বাসি ভাতও একটা আলাদা সানকিতে ঢেকে রাখে। যাবার আগে বলে যায়— আমার ফিরতে দেরি হবে, ভাত ঢাকা রইল।

বিরজু কিছু বলার আগেই কমলা তাড়াতাড়ি রওনা দেয় বিরজুর কথায় কর্ণপাত না করে।

বিরজু উদাস চোখে চেয়ে থাকে তার চলে যাওয়ার পথের দিকে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেড়িয়ে আসে বুকের অন্তস্থল থেকে। মনটা হতাশায় ভরে ওঠে। তার করারও কিছু নাই, সে অসহায়, অবস্থার দাস।

বিরজুর শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই। কয়েকদিন থেকেই এটা হয়েছে। একটু একটু করে জ্বর আসে। সে বুঝতে পারে যে তার জীবনীশক্তি একটু একটু করে কমে আসছে। মুখে কিছুই বলে না, মুখ বুজে সব সহ্য করে যায়। বেলা বাড়লে দুটি মুড়ি খেয়ে আবার ঢাকা নিয়ে শুয়ে পড়ে। দিনের ভাত পড়ে রইল, খেতে ইচ্ছা করল না।

সন্ধ্যা নাগাদ কমলা ফিরে এসে দেখে বিরজু তখনও শুয়ে আছে। ভাত খায়নি। কমলার মেজাজটা বিগড়ে যায়। অস্ফুট একটা কটুক্তি করে বিরজুকে তুলে ঘরে নিয়ে যায়।

রাতের রান্না করে বিরজুকে খেতে দেয়। বিরজু শুধায়—'সারাদিন কোথায় ছিলি? আমার কথা কি একবারও তোর মনে পড়ল না?'

'কেন, সবকিছুর হিসাব দিতে হবে নাকি; কাজ ছিল আমার।'—মুখ ঝামটে উত্তর দেয় কমলা।

বিরজু আর কথা বাড়ায় না। চুপচাপ ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। এমনিভাবেই একটু একটু করে কমলার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিরজু। এখন প্রায় বাড়ি ফিরতে দেরি করে কমলা। কোন কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস থাকে না বিরজুর। সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই।

বিরজু আরো লক্ষ্য করে যে ইদানীং কমলা তাকে একটু এড়িয়ে চলছে। আগে কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, সুখ দুঃখের দুটো কথা বলত। কিন্তু এখন যেন সে একটু উদাসীন। প্রায়ই তার কথাবার্ত্তায় বিরক্তি প্রকাশ পায়। বিরজু সব বুঝেও চুপ করে থাকে, বেশি কিছু বলার সাহস পায় না।

এখন কাজে যাবার আগে কমলা একটু পরিপাটি করে সাজগোজ করে যায়। চুলে তেল দেয়, ভালভাবে আঁচড়ায়, একটু ভাল শাড়ি পড়ে, কপালে টিপ লাগায়, কখনও পায়ে আলতা লাগায়। যাবার আগে একদিন বলে—'এখন একটা রান্নার কাজ পেয়েছি, বেতন বেশি দেবে, তবে ফিরতে দেরি হবে। খাবার ঢাকা থাকল, খেয়ে নিও।'

বিরজুর কিছু বলার ছিল না, সবকিছু শুনল. একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল।

কমলা কিছুদিন থেকে একটা মেসবাড়িতে রান্নার কাজ পেয়েছে। দু'তিনজন চাকুরীজীবি মিলে মেস। তারা খেয়ে দেয়ে যে যার অফিসে চলে যায়। শুধু একজন প্রায়ই অফিস কামাই করে। তার নাম নিশিকান্ত। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে অনেকদিন, বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে সবাই অফিস চলে গেলেও সে থেকে যায়। আর কমলা! সেও অবস্থার দাস, সারা দুপুর তারা একসঙ্গে কাটায়, বিকালে কাজ শেষ করে কমলা ফিরে আসে। শনি-রবি ছুটির দিনে অন্যান্য সবাই বাড়ি যায় একমাত্র নিশিকান্ত ছাড়া। আর ঐ দিনগুলিতে কমলাও বাড়ি ফেরে না।

এদিকে কমলা রাত্রে বাড়ি না ফেরায় বিরজু ছটফট করে, তার মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। খাবার পড়ে থাকে, প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই তার দিন কাটে। শরীরটা দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে, নড়াচড়া করার ক্ষমতাটুকু আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

কমলা ফিরে এলে অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করে—'রাতে একলা ফেলে রেখে গেলি, শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে বুঝি ভাল হতো।'

'শেয়াল কুকুর কেন, তোমাকে যমেও ছোঁবে না'—কমলা ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দেয়।

কথা বাড়ায় না বিরজু। অব্যক্ত এক বেদনা ও অভিমানে চোখের কোণ দুটি চিকচিক করে উঠে।

এমনিভাবেই দিন কাটছে। কমলা প্রায়ই রাতে বাড়ি ফেরে না। আর বিরজু তৈলশূন্য প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মত টিমটিম করে জ্বলতে থাকে, শুধু নিভে যাবার প্রতীক্ষায়।

কদিন থেকে আকাশের অবস্থা ভাল নয়। ঘন মেঘ আর প্রবল বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত, সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাইরে বেরোবার উপায় নেই। কমলা আজ দুদিন বাড়ি ফেরেনি।

আর বিরজু? তার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। রাগে, দুঃখে ক্ষোভে, অভিমানে পাগলের মত অবস্থা। বাড়িতে খাবার যা ছিল, দু'এক বেলা তাই এক-আধটু খেয়েছে, তবে অভুক্ত অবস্থাতেই কেটেছে বেশির ভাগ সময়। সঙ্গে প্রবল জ্বর। সব সময় আশা করছে এখুনি বোধহয় কমলা ফিরে আসবে। জ্বরের মধ্যে অস্ফুট স্বরে কমলাকে ডাকে।

সন্ধ্যা হল, রাত নামল, আকাশে তখনও মেঘের ঘনঘটা। বিরজু আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না। অথর্ব শরীরটা হাতে ভর দিয়ে টানতে টানতে বের হয় কমলার সন্ধানে।

ঠক্, ঠক্, ঠক্—দরজায় কে যেন টোকা দেয়, সঙ্গে একটা অস্ফুট বিকৃত আওয়াজ। বাইরে বর্ষণমুখর রাত্রি, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। আর ঘরের মধ্যে কমলা ও নিশিকান্ত নরম বিছানায় পরস্পরের কাছ থেকে ওম পেয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণে গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'কে আবার জ্বালাতন করে মাঝরাত্রে'—বিরক্তির সঙ্গে বলে নিশিকান্ত। 'ও কিছু নয়, বাতাসের শব্দ'—কমলা আধো আধো স্বরে বলে আর নিশিকান্তকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে।

তারপর কখন তারা চলে যায় ঘুমের দেশে। একটা পরম তৃপ্তির ছোঁয়া লেগে থাকে কমলার চোখে মুখে।

সকালে নিশিকান্ত দরজা খুলেই দেখতে পায় একটা ভিখারী মরে পড়ে আছে বারান্দায়। তাড়াতাড়ি কমলাকে ডাকে দেখার জন্য।

বিরজুর মৃতদেহটা চোখে পড়তেই কমলা চিত্রার্পিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু'হাতে চোখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে ঘরের ভিতর চলে যায়। তবে তার এই কান্না দুঃখের না আনন্দের তা বোঝা গেল না।

---

১৭ প্রতিহিংসা

গুলিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পচনধরা মংলুর দেহটা রাখা আছে গ্রামের বাইরে একটি মহুয়া গাছের তলায়। গ্রামেরই কয়েকজন গিয়ে দেহটা নিয়ে এসেছে পুলিশের হেফাজত থেকে। বস্তায় জড়ান দেহটা একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা।

গত তিনদিন ধরে একনাগাড়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সুর করে কেঁদে চলেছে মংলুর পিসি বড়কি মেঝেন। গ্রামের ছেলেমেয়ে বৃধ্ধবৃন্ধারা দেহটা ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কোন কথা নাই, সবাই চুপচাপ, ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। দু-একজন খুব নিচু স্বরে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিচ্ছে। বড়কা হারাম গাঁয়ের মুস্তাগির। তার কথা মত স্থির হয় মংলুর দেহ দাহ করা যাবে না, পুঁতে ফেলতে হবে। দু'জন কাঁধে করে দেহটা তুলে নেয়, কয়েকজন কোদাল গাঁইতি নিয়ে অনুসরণ করে। তাদের গন্তব্যস্থল গাঁয়ের পাশের জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট নদীর চর।

পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সীমান্তবর্তী একটি ছোট আদিবাসী গ্রাম-কেন্দডাঙ্গা। কয়েকঘর আদিবাসী নিয়ে এই ছোট গ্রাম। গ্রামের একপাশে ছোট নদী, যা সারা বছরই শুষ্ক, শীর্ণ, কোথাও কোথাও একটু জল দাঁড়িয়ে। নদীর পাড় থেকেই শুরু হয়েছে শাল, পিয়াল, মহুয়ার জঙ্গল। প্রথম দিকে একটু ফাঁকা ফাঁকা হলেও ক্রমশ তা ঘন হয়ে আছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটু সরু রাস্তা চলে গেছে পুরুলিয়া শহরের দিকে।

পাথুরে উঁচু নিচু জমি, তারই মাঝে মাঝে চাষের ছোট ছোট জমি যেগুলি বর্ষায় একবার ধান চাষ হওয়ার পর সারা বছর পতিত পড়ে থাকে। গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা জনমজুর খাটা আশেপাশের গ্রামগুলিতে; কারণ চাষে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে দু'তিন মাসের বেশি অন্ন-সংস্থান হয় না। মেয়েরা জঙ্গল থেকে শাল পাতা তুলে বিক্রি করে চাঁদপুরে মহাজনের কাছে। এছাড়া ছোট ছোট খেজুর গাছের পাতা দিয়ে তালাই ও ঝাড়ু তৈরী করে। মহুয়া ফুলের সময় মহুয়া সংগ্রহ করে, যার কিছুটা বিক্রি করে আর কিছুটা রাখে মদ তৈরীর জন্য। তবে চোলাই মদের চেয়ে ধেনো মদটাই ওদের বেশি পছন্দের।

এই গায়েরই একটি ছোট আদিবাসী পরিবার—ধলু, তার বউ আর একমাত্র ছেলে মংলু। আজকের এই কাহিনি মূলত মংলুকে নিয়েই। বাবা-

মায়ের আদরের সন্তান, গোল-গাল নাদুস-নুদুস, বয়স বছর আট-নয়। কালো কষ্টিপাথরের মত গায়ের রং, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গলায় কালো সুতো দিয়ে ঝোলান বিরাট একটি মাদুলি। তার চেহারার মধ্যে এমন এক আকর্ষণ ছিল যার ফলে সে গ্রামের সবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। প্রকৃতির সন্তান আপন খেয়ালেই বেড়ে উঠছে প্রকৃতির বুকে। কখনও হাতে তীর ধনুক নিয়ে পাখি শিকারের চেষ্টা করে কখনও ছোট বাঁশের বাঁশি নিয়ে গাছের ডালে বসে বাজায়। গ্রামের আর পাঁচটা ছেলের সাথে এখান থেকে দু'মাইল দূরে একটি স্কুলে পড়তেও যায়। এগার-বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে গিয়ে তার অক্ষরজ্ঞান ভাল ভাবেই হয়েছিল, মোটা হরফের লেখা বই পড়তে পারত, লিখতেও পারত। প্রাথমিক পরীক্ষার আগেই তার পড়াশুনার ইতি। তখন থেকে বাড়ির গরুগুলি নিয়ে চড়াতে যায় নদীর চরে। সারাদিন গরু চড়িয়ে বিকালে ঘরে ফেরে। এই গরু চড়ানর কাজ মংলুর খুব পছন্দের। গরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে সারাদিন বাঁশি বাজায় আপন মনে। তার গরু চড়ানর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিল বুধন, উকিল, হাকিম ও আরও কয়েকজন। এমনি করেই কেটে যায় তার ছেলেবেলাটা। কৈশোর পার হয়ে উপস্থিত হয় যৌবনের সীমানায়, দেহে ও মনে অনেক পরিবর্তন আসে। আগের মংলু এখন অনেক পরিণত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে বাঁশি বাজিয়ে হিসাবে গ্রামে তার বেশ নামও হয়েছে।

বাঁধনা পরবের সময় সারারাত ধরে চলে হাঁড়িয়া খাওয়া আর নাচগান। মেয়েরা সারি বেঁধে তালে তালে নাচে সঙ্গে বাজে মাদল, ধামসা, ঝাঁঝর আর মংলুর বাঁশি। মংলুর বাঁশি ছাড়া যেন নাচ জমেই না। সারাগ্রাম আনন্দে মেতে ওঠে এই ক'টা দিন। সারারাত নাচগান করে আর হাঁড়িয়ার নেশায় ভোরের দিকে যে যেখানে পায় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে।

মেয়েদের নাচের দলে তার সবচেয়ে ভাল লাগত আদরীকে। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে সেই ছিল সেরা সুন্দরী। সুতরাং তার দিকে অনেকেরই নজর ছিল। আদরীও এটা জানত তাই যে নিজেকে একটু আলাদা করে রাখত আর সবার থেকে।

অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আদরীও কলসি নিয়ে জল আনতে যেত নদীতে, মংলুও হাজির হত সেখানে নানা ছুতোয়। রক্ষণশীল আদিবাসী সমাজে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় অনেক বাধা নিষেধ ছিল। একই গ্রামে থাকা সত্ত্বেও একমাত্র শৈশবের দিনগুলি ছাড়া কোনদিন অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় নাই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধি-নিষেধগুলিও আরও বেশি লাগু হত। আদরীর দিক থেকেও কিছুটা দুর্বলতা ছিল মংলুর

প্রতি। দু'জনেই চাইত দু'জনকে, তাই মন দেওয়া নেওয়ায় কোন বাধা আসে নাই। তারপর সন্ধ্যায় নাচের আসরের সুবাদে তারা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। মংলু ও আদরীর এই ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি দিন গোপন থাকে নাই। আস্তে আস্তে গ্রামের সবাই জানতে পারে তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগের কথা এবং শেষ পর্য্যন্ত মংলুর তরফ থেকে আদরীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আর কেউ কোন আপত্তি করে নাই।

এরই মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মংলুর বাবা ও মা মারা যায় কয়েকদিনের ব্যবধানে। মংলু একেবারে একা হয়ে যায়। মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াত বনে জঙ্গলে, খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক থাকত না, উদাস হয়ে বসে থাকত সারাদিন। তার এই অবস্থা দেখে এক নিঃসন্তান বিধবা পিসি এসে তার সংসারের হাল ধরে। আস্তে আস্তে মংলু শোকের ধাক্কাটা সামলে নেয়। যেটুকু জমিজমা ছিল তাতে চাষ আবাদ করে, গরু বাছুরের যত্ন করে। কিন্তু চাষের ফসলে কয়েক মাসের বেশি সংসার চলে না তাই মংলু উপার্জন বাড়ানর জন্য অন্য উপায় ভাবে।

মংলুর গ্রাম থেকে তিন মাইলের মধ্যে চাঁদপুর মোটামুটি একটি জনবহুল এলাকা, দোকানপাট আছে, সপ্তাহ দু'দিন হাট বসে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা দোকান ঘরের জন্য ছোট ছোট পাকা বাড়ি তুলছে এবং আশপাশের গ্রাম থেকে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন কিছু কিছু লোক চাঁদপুরে এসে বাড়ি তৈরী শুরু করে। বাড়ি তৈরীর জন্য তাদের অনেকেই ট্রাক ভর্তি ইটবালি কিনতে পারত না, অল্প প্রয়োজনে তারা গাড়োয়ানদের সাহায্য নিত। মংলু এই সুযোগটা নিয়েছিল। তার নিজের একটি গরুর গাড়ি এবং একজোড়া বলদ ছিল, তাই সে লেগে পড়ল এই কাজে এবং মোটামুটি উপার্জনও করতে থাকে। তার দেখা দেখি তারই আবাল্যবন্ধু বুধনও এই কাজে লেগে যায় এবং দুই বন্ধুতে গাড়োয়ানির কাজ করতে থাকে। তারা ভাঁটা থেকে ইঁট নিয়ে আসে, নদীর চর থেকে বালি নিয়ে এসে টিন মাপে বিক্রি করে। তার জন্য প্রায়ই মংলুকে নদীর পাড় ধরে বালির চর খুঁজে বেড়াতে হত। যে নদীর কথা বলা হয়েছে তা বছরের অন্যান্য সময় জলশূন্য থাকলেও বর্ষার সময় দু-কুল ছাপিয়ে তার চেহারা পাল্টে যেত তখনই কোথাও বালির চর তৈরী হত এবং সেগুলি থেকেই মংলু ও বুধন বালির জোগান দিত।

ভোরবেলা দু'জনে বেরিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে, সারাদিন ভাড়া খাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। বুধন ফেরার পথে দোকানে খানিকটা হাঁড়িয়া খেয়ে নেয়,

মংলু দুটো ভুট্টা কিনে চিবোতে থাকে। কখনও বুধন গান ধরে, মংলু বাঁশি বাজায়। গ্রামের কাছাকাছি নদীর ধারে এলে মংলু আদরীর দেখা পায়। এমনিতে সারাদিন তাদের কোন দেখাসাক্ষাৎ হয় না। মংলুকে আদরীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে বুধনের মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে, সে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে আসে।

একই গ্রামে একই সাথে বড় হয়েছে মংলু, বুধন ও আদরী। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছে কিন্তু যখন থেকে মংলু ও আদরীর মেলামেশা বেশি হয়েছে বুধনের মনে শুরু হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া। বুধনও তো চায় আদরীকে বিয়ে করতে। তার কিসেই বা কমতি আছে? একথা সে আদরীকে দু-একবার বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু আদরীর দিক থেকে কোন সাড়া পায় নাই। আদরীর এই অবহেলায় বুধন ভিতরে ভিতরে আরও খেপে ওঠে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

মংলু একদিন তার পিসিকে সঙ্গে নিয়ে আদরীর বাবার কাছে যায় তার বিয়ের কথা বলার জন্য। আদরীর বাবা কোন কাজ করে না, সারাদিন হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকে, আর লোকটা বেশ লোভী প্রকৃতির। বিয়ের কথা শুনে সে বলে—'তা বিটির বিয়া তো দিতে হবেক, কিন্তুক বিয়ার যা খরচা তা তো দিতে হবেক।'

'তা যিটো দিবার বটেক তা দিব'—মংলুর পিসি বলে।

'আমার বিটিকে বিয়া করতে হলে একটু বেশ দিতে হবেক।'

'বলেই ফেল না, কি কি দিতে হবেক, মংলুও তো আমার ফেলনা নয়।'

'পাঁচশ টাকা নগদ, এক জোড়া খাসি, এক জোড়া শুক্রি, পাঁচ সলি চাল আর বিটিকে তিনটে রূপোর গয়না'—ফিরিস্তি দেয় আদরীর বাবা।

বিয়ের ফর্দ শুনে ঘাবড়ে যায় মংলু ও তার পিসি। পিসি বলে—'দাবীটি একটু বেশি হচ্ছে হারাম, একটু কমসম কর।'

'ক্যানে, কম করব ক্যানে, বুধনা তো এইসব দিবে বলেছে, আর যিখানে বেশি পাব সিখানেই বিটির বিয়া দিব, এই আমার সাফ্ কথা।'

আর কোন কথা না বলে মংলু তার পিসিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

মংলু খানিকটা এমনিই আঁচ করেছিল, কিছুদিন থেকে বুধনের কথাবার্তায় আর আগের মত আন্তরিকতার ছোঁয়া পেত না। আবাল্য বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আদরীকে বিয়ের ব্যাপারে তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে এক বিরাট দেওয়ার খাড়া হয়ে ওঠে।

মংলুর জেদ বেড়ে যায়, আরও বেশি পরিশ্রম করতে থাকে রোজগার বাড়ানর জন্য। অনেক সময় আর একসঙ্গে নয়, মংলু ও বুধন একা একাই বেরিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে। দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় আদরীকে নিয়ে।

যে সময়ের ঘটনা বলা হচ্ছে সে সময় পশ্চিম বাংলায় চলছিল বিশেষ সন্ত্রাসবাদী এক রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ। যারা চাইছিল এক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর জন্য তারা হিংসারও আশ্রয় নেয় নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য। খুন-জখম-অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। তবে প্রশাসনও তৎপর ছিল এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনে।

একদিন বিকাল নাগাদ মংলু ফিরে এসে নদীর ধারে যায় নতুন বালির চর খুঁজতে, যেখানে পাওয়া যাবে বেশ ভাল জাতের বালি আর তাতে দামও ভাল পাওয়া যাবে। খুঁজতে খুঁজতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে, একটি চরের সন্ধান পায়, হাত দিতে বালি খুঁড়ে বালির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে থাকে। এমন সময় সেখানে হাজির হয় সশস্ত্র কয়েকজন পুলিশ। একজন মংলুর হাতটা খপ্ করে ধরে জিজ্ঞাসা করে—'এই ব্যাটা এখানে কি করছিস?'

হঠাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশ দেখে মংলু হকচকিয়ে যায়, কোনমতে তোতলাতে তোতলাতে জবাব দেয়—'বালি দেখছিলাম বাবু।'

'বালি দেখছিলি, এখন দেখ'—বলেই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সজোরে মংলুর পেটে আঘাত করে, মংলু যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে মাটিতে পড়ে যায়। ঘাড় ধরে তুলে জিজ্ঞাসা করে—'বালিতে কি লুকিয়ে রাখছিলি? দলে আর কে কে আছে বল।'

মংলু কোন জবাব দেবার আগেই সজোরে একটি বুটের লাথি পড়ে তার পিঠে। মংলু যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। এরপর সেই টহলদার বাহিনি তাকে জিপে তুলে থানায় নিয়ে আসে। থানায় সে চলে আর একদফা নির্মম প্রহার। কিন্তু শত চেষ্টাতেও নিরপরাধ মংলুর মুখ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারে না। ঘটনাটা প্রচার হতে সময় লাগে না, গ্রামের সবাই জেনে যায় কিন্তু মংলুর হয়ে কেউ এগিয়ে আসে না। তবে একজন আসে, সে বুধন। কয়েকদিন পর কৌতুহলের বশে বুধন সদরে যায় এবং থানার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একজন কনস্টেবল তার ঘোরাফেরা দেখে তাকে ডেকে নিয়ে যায় থানার বড়বাবুর কাছে।

'কি নাম তোর?'

'আজ্ঞে, বুধন হেমরম।'

'বাড়ি কোথায়?'

'আজ্ঞে কেন্দডাঙ্গায়।'

কেন্দডাঙ্গার নাম শুনে বড়বাবুর টনক নড়ে।

'মংলুকে চিনিস?'

'আজ্ঞে, চিনি সে আমাদের গাঁয়ের লোক, ছোটবেলা থেকেই তাকে চিনি।'

এরপর বড়বাবু তাকে অনেক প্রশ্ন করে এবং যখন ছাড়া পেল তখন তার চোখেমুখে একটা খুশির ভাব। মংলুর মামলাতে সে সাক্ষী দেবে।

শুরু হল মংলুর বিচারের নামে প্রহসন। তদন্তকারী অফিসার তার বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দিয়েছে সেখানে আছে মংলুর বিরুদ্ধে নরহত্যা, দেশদ্রোহিতা ও বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগ, যে অস্ত্রটি নদীরচর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসাবে বুধন তখন পুলিশের বড় সহায়। বিচারে মংলুর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। মংলুর জগৎটা ওলট-পালট হয়ে গেল।

দশ বছরের সাজা ভোগ করে মংলু গ্রামে ফিরে আসে। মংলুর বয়সও দশ বছর বেড়েছে কিন্তু চেহারায় বেড়েছে অনেক বেশি। অনেক পরিবর্তন হয়েছে গ্রামে, মানুষের চালচলনে। মংলু সোজা চলে যায় আদরীর বাবার বাড়িতে, দশ বছরে জেল খাটলেও সে আদরীর কথা কোন সময়েই ভুলে নাই। তার আশা ছিল আদরী বোধহয় তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে এবং তার সব কথা শুনলে আদরী নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে সে নিরপরাধ। কিন্তু মংলু জানত না মানুষের মনের খবর, সাধাসিধা মংলুর পক্ষে দুনিয়াটাকে চিনতে অনেক বাকি ছিল। আদরীর বাড়িতে এসে দেখল ঘরটা ভেঙে গেছে, মানুষ বাস করার কোন চিহ্ন নাই। আদরীর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছে। মংলু একটু ইতস্তত করে এদিক-ওদিক তাকায়, দেখল দূরে আদরী কলসী মাথায় জল নিয়ে আসছে, কোলে একটি বাচ্চা আর সঙ্গে আরও দুটি। মংলুকে আদরী দেখতে পায়, তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, ঘর থেকে বুধন বেরিয়ে এসে মংলুকে দেখতে পায়। মংলুর ঠিক বুঝতে বাকি থাকল না, অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বুড়ি পিসি মংলুকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

মংলুর শরীর ও মন দুটোই ভেঙে গেছে। হাসিখুশি সদানন্দ মংলুর এ চেহারা কল্পনাও করা যায় না। কারও সঙ্গে মেশে না, বেশি কথাও বলে না। গ্রামের

কেউ তার কাছে আসে না, বুধন তো নয়ই। মংলু মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে চলে যায়, উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তার যেন এখন কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কর্ম নাই, ঘরবাড়ি নাই। সংসারে সে একা নিজের বলতে কেউ নাই। এমনিভাবেই ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে পড়ে গভীর জঙ্গলে, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে।

'এই তুই কে রে?'—কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে একজন।

মংলু চোখ খুলে দেখে তার সামনে তিন-চার জন মানুষ, পড়নে ফুলপ্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, মুখে গামছা বাঁধা, কাঁধে ব্যাগ। তাদের কারো হাতে বন্দুক।

'আমি মংলু'—নিস্পৃহ ভাবে জবাব দেয় মংলু।

'কোথায় থাকিস, কি করিস, এখানে কি করছিস—এমনি একগাদা প্রশ্ন ছুটে আসে তার দিকে। মংলু ধীরে সুস্থে সব কথার জবাব দেয়।

আগন্তুক লোক ক'জন তার পরিচয় পেয়ে একটু আশ্বস্ত হয়, শুরু হয় আরও জিজ্ঞাসাবাদ। কথায় কথায় মংলু তার জীবনের সব কথাই বলে, কিছুই গোপন করে না, এমনকি আদরীর কথাও।

লোক ক'জন তাকে নিয়ে যায় একটা গোপন ডেরায়, শুরু হয় তার মগজ ধোলাই।

'তোর উপরে যে অন্যায় হল তার বদলা নিবি না, বিনা দোষে পুলিশ তোকে দশ বছর জেল খাটাল, তোর সব আশা শেষ করে দিল, তার প্রতিবাদ করবি না, বদলা নিবি না, তুই না পুরুষ মানুষ'—শুরু হয় একের পর এক প্রশ্নবাণ। তবে তখন কথাবার্তা সব হচ্ছিল সাঁওতালি ভাষায়।

ক্রমাগত এই কথাগুলি শুনতে শুনতে মংলুর মাথাটা গুলিয়ে যায়, মাথা গরম হয়ে ওঠে, তার পৌরুষ জাগ্রত হয়। চেঁচিয়ে বলে ওঠে—'হঁ, হঁ, বদলা লিব।'

এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে চলল তার শিক্ষাদান, তাদের দলের কর্মপদ্ধতির বর্ণনা ইত্যাদি। মংলু তখন থেকেই সেই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর একজন সদস্য হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে তার ট্রেনিং হল অস্ত্র চালনার ও অন্যান্য কাজের। মংলু কিছুটা লেখাপড়া জানায় দলের আরও সুবিধা হল। সারাদিন ডেরায় থেকে মংলু অপটু হাতে লাল কালিতে পোস্টার লিখে দেয়। পরের দিন অন্য একদল এসে সেগুলি নিয়ে যায়। কিছুদিন কাটিয়ে সে দলের নির্দেশেই বাড়ি ফিরে আসে, তার কাজের দায়িত্ব বুঝে নেয়। সারাদিন মংলু বাড়ির বাইরে খুব একটা যায় না, শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়, গ্রামের লোকজনও তার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায় না।

রাত নিশুত হলে তার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, অজানা দু-একজন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, প্রয়োজনীয় নির্দেশ পায়, রাত্রে তাদের সঙ্গে বেড়িয়ে যায় মংলু, আবার ভোর হতেই ফিরে আসে। এমনিভাবে গোপনেই চলতে থাকে দলের কাজকর্ম, কেউ টের পায় না।

দলের তৎপরতা বাড়ছে, মাঝে মাঝে তাকেও যেতে হয় অ্যাকশন করতে। মংলু এখন দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, সে এখন অস্ত্রচালনা, বোমা বাঁধা, গ্রেনেড ছোঁড়া, মাইন লাগানর কাজে পারদর্শী। তবে সে এখনও জানে না এইসব অস্ত্রশস্ত্র কারা জোগান দেয় এবং কিভাবে এসে পৌঁছয়। এইসব অ্যাকশনে তার দলের ক্ষয়ক্ষতি যেমন হয় পুলিশেরও তেমনি হয়। পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, এরাও আরও সজাগ হয়। সব সময়েই পুলিশের গাড়ি আসা যাওয়া করছে, গ্রামে গ্রামে তল্লাশি চলছে, অনেক সময় অকারণে লোকের হয়রানি বাড়ছে।

চর মারফত খবর এসেছে বিশেষ পুলিশি অভিযানের। বড় একটা পুলিশ বাহিনি নিয়ে জেলার এক পদস্থ পুলিশ অফিসার এই অভিযান পরিচালনা করবেন। খবরটা পেয়ে মংলুর রক্তও নেচে ওঠে, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার ফল বোধহয় এবার পাওয়া যাবে। দলের সদস্যদের মধ্যে খবরটা দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হল আর ঠিক হল তাদের ইতিকর্তব্য।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মংলু ও তার কয়েকজন সঙ্গী তাদের কাজ রাতের অন্ধকারে শেষ করে প্রতীক্ষায় থাকল। ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটে নাই, একটা খালি জিপ রাস্তা পার হয়ে গেল খুব ধীরগতিতে। দ্বিতীয় জিপটা কাছে আসতেই বিকট বিস্ফোরণের শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। কিছু বোঝার আগেই জিপটা টুকরো-টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর গাড়ির আরোহীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কিছু কিছু ছিটকে গাছের ডালে আটকে গেল।

মংলু দূর থেকে সব কিছু লক্ষ করছিল। আনন্দের আতিশয্যে সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'পেরেছি, আমি পেরেছি।'

ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশের দলটি হতভম্ব হয়ে পড়ে, সম্বিৎ ফিরলে শুরু করে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ।

মংলু পালাবার সুযোগ পায় না। এ.কে.ফরটি সেভেনের এক ঝাঁক গুলি তার শরীরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।

—

১৮ এক বিপ্লবীর অপমৃত্যু

এমন নৃশংস হত্যার ঘটনা সাধারণত দেখা যায় না। দেহটা একটা গাছের ডাল থেকে ফাঁস লেগে ঝুলছে, বুকে একটা গুলির দাগ। সারা শরীর রক্তে ভেসে গেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ে জমাট বেঁধে আছে পায়ের তলায়। জমাট রক্তের চারপাশে পিঁপড়ের দল থিকথিক করছে। ঘটনাটা হয়ত আগের রাতের, সকালবেলায় গ্রামের একটি লোক বনের ধারে গিয়ে দেখতে পায় ঝুলন্ত মৃতদেহটা। কে বা কারা খুন করেছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না, তবে অনেকেই আঁচ করছে ব্যাপারটা অথচ মুখ ফুটে কেউ কোন কথা বলছে না।

থানায় খবর নিয়ে গেছে চৌকিদার। থানা এখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে, এখনও পুলিশ এসে পৌঁছয়নি।

মৃতদেহটি দেখে গ্রামের লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। মৃতদেহটি এই কুসুমবনি গ্রামের ভূষণ মণ্ডলের ছেলে জীবনের। খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না, প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে, গাছটার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভূষণ মণ্ডল ও তার স্ত্রী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেই চলেছে, কোনমতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। বাড়িতে ভূষণের বৃদ্ধ বাবা দেবেন মণ্ডল খবরটা শোনার পর থেকেই একটানা বিলাপ করে চলেছে। অকুস্থলে আসার ক্ষমতা নাই, অসুস্থ শরীরে দাওয়ায় বসে কাঁদছে।

দেবেন মণ্ডলের খুব আদরের ছিল এই একমাত্র নাতিটি। বংশের একমাত্র প্রদীপ। সেই প্রদীপটাই আজ নিভে গেল। দেবেন মণ্ডলের বংশ লোপ পাবে। নানা ভাবনা চিন্তায়, সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। মাঝে মাঝে বুক চাপড়ে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠছে নাতির জন্য।

সেই সময় পশ্চিম বাংলায় চলছে এক দুর্যোগের সময়, বাতাসে ভাসছে বারুদের গন্ধ, গ্রামেগঞ্জে, শহরে, সর্বত্র এক আতঙ্কের পরিবেশ। সমাজের ধনী বা মধ্যবিত্ত কোন মানুষের মনেই শান্তি নেই, সব সময় মনে একটা ভয়। কখন কার উপর আক্রমণ নেমে আসবে কেউ জানে না এবং এই ভীতির জন্য দায়ী যে দল তারা এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য এই খুনের রাজনীতি আমদানি করেছে, সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করে। অবহেলিত, নিপীড়িত, দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের জন্য এই রাজনীতি সমাজের আখেরে কি মঙ্গল করবে

তাও বুঝতে পারে না সাধারণ মানুষ। কিন্তু এ এক দমবন্ধ করা পরিবেশে সবাই হাঁফিয়ে ওঠে।

বিহার সংলগ্ন পশ্চিম বাংলার একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম এই কুসুমবনি। দূরে দেখা যায় ম্যাসানজোড় পাহাড়ের শ্রেণী। আশেপাশে আরও ছোট ছোট গ্রাম। অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটা পাহাড়ি ধরনের। এখানে জমি উঁচু নিচু, ঢালু প্রান্তর গুলি শেষ হয় একটি ছোট নালায়, যেখানে ঝরনার জল কিছু কিছু জমে থাকে। এই নালাগুলিকে এখানকার লোকে 'কাঁদর' বলে। কুসুমবনি গ্রামের পাশের এই কাঁদরটির অপর পাড় ক্রমশ উঁচু হতে হতে একটি পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। পাহাড়টি ঘন জঙ্গলে ঢাকা, তারই মধ্যে পায়ে হাঁটা পথ নানাদিকে ছড়িয়ে গেছে। আশেপাশের অধিবাসীরা এই জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে। আর সংগ্রহ করে মহুয়া, কেঁদ, হরিতকী, বহেড়া, বনফুল ইত্যাদি ফল।

পাহাড়টি খুব উঁচু নয়; স্বল্প পরিসরের। পাহাড়ের অপর দিকের ঢাল শেষ হয়েছে সিদ্ধেশ্বরী নদীর কিনারায়। নদীর পাড় বরাবর গরু গাড়ি যাবার রাস্তা। সিদ্ধেশ্বরী নদী এখানে বেশ চওড়া। সারা বছর পুরো নদীতে জল থাকে না, একপাশে খাত বেয়ে জল বয়, বাকিটা বিস্তীর্ণ বালুচর। নদীর ওপারে বিহারের অধুনা ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা জেলা।

কুসুমবনি এবং তার আশপাশের গ্রামগুলি এমনই এক ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। আশেপাশে কাঁটাবোনা, মহিষডোবা, ধূপসরা, পাকুরগ্রাম ইত্যাদি। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উপজাতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

গ্রামগুলিতে যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা নাই, বাস চলে প্রায় দশ মাইল দূরে পাকা রাস্তায়। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী ও জনমজুর। প্রতিটি গ্রামে দু-একজন সম্পন্ন জোতদার আছে, যাদের দখলে আছে বেশিরভাগ কৃষিজমি। বাদবাকিদের খুব অল্পস্বল্প জমির চাষ আর দিন মজুরিই ভরসা।

সম্পন্ন গৃহস্থেরা এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে জমিগুলি আত্মসাৎ করে রেখেছে। প্রায় প্রতিটি গরিব পরিবারের কিছু কিছু জমি বাঁধা পড়ে আছে বড় জোতদারের কাছে। জোতদাররা নিজের হাল গরু নিয়ে চাষ করায় আর কিছু কিছু জমি ভাগচাষে দেয়। ভাগচাষীদের উৎপন্ন ফসলের বেশির ভাগই জোতদারের গোলায় উঠে, এমনি এখানকার অলিখিত নিয়ম।

দেবেন মণ্ডলও এমনি একজন দরিদ্র কৃষক। তার বাপ-ঠাকুরদারা অনেক কষ্টে পাথুরে জমির মাটি সরিয়ে যে চাষযোগ্য জমি তৈরী করেছিল অভাবের তাড়নায় তার অনেকটাই চলে গেছে মহাজন ও বড়জোতদারের কবলে। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তাদের পেটের ভাগ জোগার করতে হয়। দেবেন মণ্ডলের বয়স হয়ে যাবার পর তার ছেলে ভূষণ মণ্ডলও একই ভাবে সংসার প্রতিপালন করে আসছে।

ভূষণের ছেলে জীবন, বয়স ১৮/১৯ বৎসর, পড়াশুনা প্রাইমারি পর্য্যন্ত তারপর থেকে চাষের কাজে বাবার সাহায্যকারী।

জীবনের এই করুণ পরিণতি কিন্তু একদিনেই হয়নি। সেও জড়িয়ে পড়েছিল এক বিপ্লবী দলের কার্যকলাপের সঙ্গে।

জীবন উদয়াস্ত পরিশ্রম করত তার বাবার সঙ্গে, অবসর সময়ে গরুগুলিকে নিয়ে চড়াতে যেত কাঁদরের ধারে, জঙ্গলের মাঝে। সেখানেই পরিচয় হয় এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে। যুবকটির বয়স ২৮/৩০ বৎসর, পরণে খুব সাধারণ একটি প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট, কাঁধে সাইড ব্যাগ, একমুখ কয়েকদিনের না কামান দাড়ি, চুল উস্কো-খুসকো।

জঙ্গলের ভিতর গরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল জীবন। চোখ বন্ধ করে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ হতে চোখ খুলে সামনেই দেখতে পায় আগন্তুক যুবকটিকে। চমকে উঠে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। যুবকটি তাকে ইশারায় বসতে বলে এবং জীবনের পাশে সেও বসে পড়ে।

অপরিচিত যুবকটি বেশ ভালভাবেই তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। একে একে তার পারিবারিক অকথা ও গ্রামের অন্যান্য লোকজনের খবর নেয়। সরল সাধাসিধে জীবন অকপটে সব কথা তাকে জানায়, এমনকি, গ্রামের জোতদার মহাজনদের শোষণের কথাও।

কথাবার্তায় অনেকক্ষণ কেটে যায়, যুবকটির কথায় জীবনের অনেক কিছুই গোলমাল হয়ে যায়।

'তুমি কি চাও না তোমাদের অকথা আর একটু ভাল হোক, মহাজনের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাও?'—বলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যুবকটি জীবনের মুখের দিকে তাকায়।

যুবকটির কথাবার্তা এবং চোখের চাউনিতে এমন একটি ভাব ছিল যা জীবনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। সে ভয়ে ভয়ে বলে—'ভালভাবে থাকতে তো

চাই, কিন্তু তা কি ভাবে হবে? জমি জায়গা তো সব মহাজনের ঘরে বাঁধা পড়ে আছে।'

'সব ফিরে পাবে, তোমাদের যাতে ভাল হয় তা আমরা দেখব, তবে তোমাদেরও আমাদের কথা শুনতে হবে। কি পারবে তো?'

জীবন ভয়ে ভয়ে বলে—'বলুন না কি করতে হবে'।

'বলব, তবে আজ আর নয়, আর একদিন। আবার দেখা হবে। তবে আমাদের এই দেখা হওয়ার কথা এখন কাউকে কিছু বলো না। আমি দুদিন পরে আবার আসব, এই সময়ে, এই জায়গায়'—বলেই যুবকটি হনহন করে জঙ্গালের মধ্যে হারিয়ে গেল।

জীবন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, কিন্তু একটা চিন্তা তার মনে থেকেই গেল। সে ভেবে কুলকিনারা পায় না।

সেদিনের মত গরুর পাল নিয়ে বাড়িতে এল। একটা অস্বস্তি সব সময় তার মনের মধ্যে অথচ মুখ ফুটে কারো কাছে কিছু বলতেও পারে না। যুবকটির নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায়।

দুদিন পর একই সময়ে একই জায়গায় গরু নিয়ে হাজির হয় জীবন। কিছুক্ষণের মধ্যে আগের দিনের যুবকটি আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল। এলাকার নানা খবর সংগ্রহ করে নিয়ে গেল তারা। এক অজানা আশঙ্কায় জীবনের বুকটা দুরদুর করতে লাগল। সে মনকে শক্ত করার চেষ্টা করে। অপরিচিত যুবক দুটির কথায় সে অনেক কিছু জানতে পারে। তার অধিকার, অধিকার অর্জনের জন্য দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

আগেই বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জায়গার মত নয়। বিশাল বিশাল এলাকা নিয়ে উঁচু নিচু ঢেউ খেলান ডাঙ্গা, সেখানে ইতস্তত শাল, মহুয়া, হরিতকি, পলাশ, শিমূল গাছ। মাঝে মাঝে বড় পাথরের চাতাল আর বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড। ঢেউ খেলান ডাঙ্গার নিচু অংশে ছোট ছোট জলধারা। রাস্তাঘাট তেমন কিছু নাই, শুধুমাত্র গরুর গাড়ি চলাচলের গো-পথ। সেই পথও বর্ষাকালে মাঝেমাঝে কাদায় ভর্তি থাকে, স্থানীয় ভাষায় বলে 'গাদ'। আর সেই গাদের উপর দিয়ে গাড়ি যাবার সময় চাকার অর্ধেকের বেশি ডুবে যায় কাদায়। কয়েকজন লোক আগে এবং

পিছনে ঠেলে গাড়ি পার করে দেয়। অবশ্য অন্যান্য সময় এই কাদা থাকে না বলে কোনরকমে গাড়ি চলাচল করে।

এখানকার মানুষের জীবনযাত্রায় আধুনিকতার কোন ছোঁয়া নেই। গ্রামে দু-একজনের বাড়িতে সাইকেল আছে। প্রয়োজনে একজনের সাইকেল অন্যজনে ধার নিয়ে দূরে কোথাও যায়। বিদ্যুৎ বা পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পন্ন গৃহস্থেরা নিজেদের প্রয়োজনে বাড়িতে পাতকুয়া কাটায়। অন্যান্যদের পুকুর ও বিলের জলেই প্রয়োজন মেটাতে হয়।

আশেপাশে কোন গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না। কালীপূজা হয় কয়েকটি তবে নবান্নের সময় প্রতি গ্রামেই অন্নপূর্ণা পূজা হয়। দুর্গাপূজা দেখতে গেলে দশ মাইল দূরে যেতে হয়। এখানকার মানুষেরা খুব অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে, কোন বিলাসিতার কথা ভাবতে পারে না।

জীবনদের বাড়ির সামনে একটি পায়ে চলা পথ আছে, তারপরই শুধু রয়েছে গাছপালার জঙ্গল। তাদের একটি মাত্র মাটির বাড়ি, খাপরার চাল। দু-একটি চালা খড়ে ছাওয়া, রাস্তার ধারে এমনি একটি চালাতেই দেবেন মণ্ডল থাকে। হাঁপানির রুগি, গরমে বাড়ির মধ্যে থাকতে পারে না, আর রাতে বারবার উঠতে হয় বলে এই চালাটিই সে থাকার জন্য পছন্দ করেছে। সারা রাত প্রায় জেগেই কাটে তার, একটি হাতপাখা নিয়ে একগাদা জীর্ণ ময়লা কাঁথা বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকে। জীবন মাঝে মাঝে এসে তার কাছে বসে। নাতিকে সে খুব ভালবাসে। একদিন জিজ্ঞাসা করে—'ও দাদুভাই, রাতের অন্ধকারে এই গেরামের রাস্তায় কারা যায় বলতে পারিস। আগে তো কেউ যেত না। এখন প্রায়ই মাঝরাতে পায়ের শব্দ পাই। তবে আঁধারে কিছু ঠাওর করতে পারি না।'

'ও কিছু নয়, কারো গরুটরু হবে, গোয়াল থেকে বেরিয়ে পড়ে।'

দেবেন মণ্ডল জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারে না, বলে—গরুর পায়ের শব্দ যে অন্যরকম হবে ভাই। ওগুলো পায়ের শব্দ, শুধালে কোন জবাব দেয় না।

'তুমি ভুল শুনেছ, হয়তো ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ।'

দেবেন মণ্ডল ভাবে, 'সত্যিই কি স্বপ্ন, আমি যে পষ্ট শুনতে পাই।'

এদিকে আতঙ্কের পরিবেশ আরও জাঁকিয়ে বসে। প্রায়ই রাতে শোনা যায় দূর থেকে আসা বোমা-গুলির শব্দ। নানা রকমের খবর এসে পৌঁছয় গ্রামে। গ্রামের একজন শহর থেকে ফিরে যে খবর দেয় তাতে তারা আরও ভীত হয়ে পড়ে। সকাল হলেই খবর পায় কালরাতে কালিবাঁধের দত্তদের বাড়িতে

ডাকাতি হয়েছে। বন্দুক ছিনতাই করে নিয়ে গেছে আর যাবার সময় ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

কোনদিন শোনে স্কুলবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, রানীদহের জোতদার ও সুদখোর মহাজন ভবেশ সাহাকে রাত্রে কারা খুন করে গেছে। এমনি নানা দুঃসংবাদ আসতে থাকে দিনের পর দিন। মানুষের রাতের ঘুম চলে যায়, বিনিদ্র রজনী যাপন করে সবাই। সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যে গল্পের আড্ডা বসত তা বন্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যা হতেই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে বাড়িতে বন্ধ হয়ে থাকতে লাগল। পারতপক্ষে রাত্রে কোন লোক বাইরে বেরুতে চাইত না। দু-একজন অবস্থাপন্ন জোতদার প্রাণের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে লাগল। সন্ধ্যা লাগলেই গ্রামগুলি শ্মশানপুরীর চেহারা নিত। একমাত্র কুকুরগুলি সারারাত জেগে চিৎকার করতে লোকের আতঙ্ক আরও বাড়ত।

বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে জীবন এখন অনেক কিছুই শিখেছে। সে এখন বোমা বাঁধতে পারে, বন্দুক চালাতে পারে। তার বাবা ও ঠাকুরদা এসব গোপন কাজকর্মের কোন সন্ধান পায় না। গভীর রাত্রে বেড়িয়ে গিয়ে অপারেশন শেষ করে ভোর হবার আগেই ফিরে আসে। সারাদিন বাড়িতে ঘুমায়, চাষবাসের কাজে মন বসে না। একদিন চুপিসারে একটি ছিনতাই করা বন্দুক তার ঠাকুরদার বিছানার গাদায় লুকিয়ে রাখে, দেবেন মণ্ডল বুঝতেও পারেনা।

কিছুদিন এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে থেকে এবং তাদের কার্যকলাপ দেখে জীবনের সাহস অনেকটা বেড়ে যায়। ঐ বিপ্লবী দলের নাম শুনলেই যে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তা বিলক্ষণ বুঝতে পারে। শুধু তাদের দলের নাম শুনলেই বিনা প্রতিরোধে তারা তাদের কাজ করতে পারে। আস্তে আস্তে দলের সদস্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অসংখ্য দরিদ্র ও বেকার যুবক তাদেরকে সমর্থন জানাতে লাগল। যদিও প্রকাশ্যে তারা দলের কথা খুব বেশি একটা বলত না। তাদের কাজ চলত রাতের অন্ধকারে।

জীবনের ধারণা হয়েছিল যে এই বিপ্লবী দলে যোগ দিলে আর তাদের কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না, অভাব-অনটন ঘুচে যাবে, ভালভাবে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু কই তাতো হচ্ছে না, তাদের অবস্থার তো কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। বাড়িতে খাবার অভাব যেমন ছিল তেমনই রইল। মাঝে মাঝে এই চিন্তাগুলি তার মনে ঘুরেফিরে আসতে থাকে। সে তো ভালভাবে খাওয়া-পড়ার লোভেই এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, কিন্তু তার অবস্থা তো

যে কে সেই। অথচ ওরাই তো বলেছিল সবকিছু পাল্টে যাবে। তবু কতকগুলি অপরাধ আর দুষ্কর্মের সাক্ষী হয়েই কি থাকতে হবে? এমনি নানা প্রশ্ন তার মাথায় আসতে থাকে।

এমনিভাবে চিন্তা করতে করতেই তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে। তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছে এই কথাগুলি খুব সাবধানে বলে এবং বুঝতে পারে যে প্রত্যেকেরই মনে এই ধরনের প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। সে আর দেরী করেনা। সমমনস্ক কয়েকজনকে নিয়ে তার নতুন কার্যকলাপ শুরু করে। শেখানো আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে সে দু-নৌকায় পা দেয়।

যে দু'জন যুবক তাকে এবং তার মতো অনেককে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল তারা এখানে আর বেশি আসে না। জীবনই এখন এখানকার নেতা, সুতরাং তার কাজের স্বাধীনতাও এখন অনেক বেশি। তার কাছে এখন একটি বন্দুক, কিছু কার্তুজ, বোমা ও বোমা তৈরীর মশলা মজুদ থাকে।

রাতে অপারেশনে যায় জীবন তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে। রাত শেষ হবার আগেই ফিরে আসে। তার বাড়িতে জমতে থাকে লুট করা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি। নিজেদের মধ্যে তা ভাগ বাঁটোয়ার করে নেয়। খুব সাবধানে খরচ করে এই টাকা-পয়সা। এখন আর তার পরিবারে খাবার কোন অভাব নাই, তবুও যতদূর সম্ভব রাখঢাক করে থাকতে চায়। এমনিভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকটি মাস। দিন দিন জীবনের লোভ বাড়তে থাকে।

হঠাৎ করে আশপাশের এলাকায় ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সবারই মনে একটা খটকা লাগে। তবে কি বিপ্লবের নামে ডাকাতি হচ্ছে আর ব্যক্তি বিশেষের উপর আক্রমণ করে ব্যক্তিগত হিংসা চরিতার্থ করছে সেই বিপ্লবী দলের সদস্যরা। যে বিপ্লবীদের নামে মানুষ ভয়ে কাঁপত আস্তে আস্তে তাদের সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হতে লাগল। যে দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা সুদিনের অপেক্ষায় দিন গুনছিল তারাও আশাহত হল।

একদিন গভীর রাত্রে জীবনের বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল। জীবন জানত এই ডাক কে বা কারা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে দু'জন যুবকের সঙ্গে। গ্রাম ছেড়ে কাঁদরের দিকে তারা চলতে থাকে। পথে তাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয় না। এটা অবশ্য তাদের দলের একটা নিয়ম। রাস্তা চলার সময় নিঃশব্দে চলতে হবে, কোন কথা হবে না, কথা হবে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তাও আবার নিচুস্বরে। ওরা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে

পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট স্থানে। সেখানে আরও দু-তিন জন অপেক্ষা করছিল, অন্ধকারে জীবন তাদেরকে চিনতে পারে না।

একটা বড় পাথরের উপরে যে বসেছিল সে কথা শুরু করল কোন ভূমিকা না করেই, অবশ্য তার আগে জীবনের কাছ থেকে বন্দুক ও কার্তুজগুলি হস্তগত করে নিল।

সংক্ষিপ্ত বিচারপর্ব শেষ হল। বিচারকের আসনে আসীন ব্যক্তির বক্তব্য এই যে তারা ডাকাতি করার জন্য বিপ্লব করতে আসে নাই। তাই দলের কেউ যদি তাদের নাম ভাঙিয়ে ডাকাতি করে বেড়ায় তা এক অমার্জনীয় অপরাধ আর সেই অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

কথাটা শুনে শিউরে উঠল জীবন, কিছু না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

একজন ক্ষিপ্রহস্তে একটা দড়ির ফাঁস তার গলায় পড়িয়ে দড়ির অপর প্রান্ত গাছের ডাল পার করে টেনে তুলল আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বুলেট জীবনের বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

প্রাণহীন জীবনের দেহটা গাছের ডালে ঝুলতে লাগল আর পায়ের নিচে শুকনো ঝরাপাতার উপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে লাগল টপ্—টপ্—টপ—।

১৯

১.

ঘণ্টা দুই আগে মারা গেছে সুনীতা, দেহটা তখনও হাসপাতালের বেডে রাখা আছে সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে। চার ঘণ্টার আগে মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে না। সুনীতার স্বামী ঝুমরু বাইরে গাছতলায় বাঁধান বেদীতে বসে একটানা অনুচ্চস্বরে কেঁদেই চলেছে। মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলছে। তার কাছে আর কেউ নাই—না কোন আত্মীয়স্বজন, না বন্ধুবান্ধব। আজ সে একঘরে, এই বিপদের দিনে কেউ এসে দাঁড়াবে না তার পাশে। খবর চলে গেছে ঝুমরুর শ্বশুরবাড়িতে, সেখান থেকে লোকজন এলে তবেই সুনীতার সৎকার হবে।

গতকাল থেকেই পেটে কিছু পড়েনি ঝুমরুর। যে পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা তার চোখের সামনে ঘটল সেখানে তার করার কিছু ছিল না, সে ছিল নিছক অসহায় একজন দর্শকমাত্র। তবুও সে হাতজোর করে সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল, পায়ে ধরে সুনীতার প্রাণভিক্ষা করেছিল প্রতিবেশীদের কাছে। কিন্তু কেউ কোন কথা শোনে নাই, কেউ তার কাতর অনুনয়ে সাড়া দেয় নাই।

সুনীতার মারা যাবার পর এই দু'ঘণ্টায় তার চিন্তার জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ওলটপালট হয়ে গেছে। যে উত্তেজনার বশে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়ে গেছিল, সেগুলি আবার ফিরে আসছে। কাছে একটাও পয়সা নাই। পেটটা ঠাণ্ডা করার জন্য জল খেয়ে আসে ভরপেট। আবার এসে বসে বাঁধান গাছের তলায়। বাঁধান চাতালের উপর হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ঝুমরু। আজ সে একা, তার পাশে দাঁড়ানর মত কেউ নেই। আর সুনীতা ছাড়া তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। আজ প্রায় চৌদ্দ বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। তারপর থেকেই সংসারে তারা শুধু দু'জন। তৃতীয় জনের আবির্ভাব ঘটেনি তাদের সংসারে, আর সেই কারণেই আজ তার এই অবস্থা।

খুব প্রাণচঞ্চল ও কাজের মেয়ে ছিল সুনীতা। বিয়ের পর থেকে সংসারের কথা কোনদিনই ভাবতে হয়নি ঝুমরুকে। দু'জনেই কাজ করত আর তাতে তাদের বেশ ভালভাবেই চলে যেত। পাড়ার অনেকে এইজন্য ঝুমরুকে একটু ঈর্ষার চোখেই দেখত। তবে সুনীতা সবার সাথে মিশতে পারত, সবাইকে

আপন করে নেবার একটা ক্ষমতা ছিল। ভালও বাসত পাড়ার লোকে তাদের দু'জনকে। লোকের বিপদে আপদে এগিয়ে যেত সুনীতা ও ঝুমরু। সাহায্য করতে কায়িক শ্রম ও অর্থ দিয়েও। আর আজ ঝুমরু ভাবতেও পারে না সুনীতার এই পরিণতির কথা। ভাবতে ভাবতে চোখের জলে কখন গাল দুটি ভিজে গেছে।

বিয়ের তিন-চার বছর পরও যখন তাদের কোন সন্তান হল না তখন থেকেই প্রাণচঞ্চল সুনীতা কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সব সময়েই একটু বিষণ্ণ ভাব, কাজ করতে করতে হাত দুটি থেমে যেত, চুপচাপ বসে থাকত। কখনও ঝুমরুকে বলত—আমার কি কুনু ছেলা-পিলা হবে না, আমি কি বাঁজা হয়েই থাকব।

ঝুমরু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত—উ কথা বুলিস না, হবে, হবে, ঠিক হবে, আমরা তো এখনও বুড়িয়ে যাই নাই।

তবে ঝুমরুর এই আশ্বাস সুনীতাকে কতটা আশ্বস্ত করত তা বোঝা যেত না।

'আমি বুলছিলাম কি, একবার গুণিনের কাছে গেলে হত না? যদি কুছু উপায় করে দেয়'—বলেই সুনীতা ঝুমরুর মুখের দিকে তাকায় তার মতামত জানার জন্য।

'তা, তু বুলছিস, যখন, যাব একদিন তোকে গুণিনের কাছে লিয়ে'—ঝুমরু ভরসা দেয়।

গেছিল তারা গুণিনের কাছে। গুণিন গণনা করে বলে—'শিং বোঙার থানে শনিবার একট লাল মোরগ বলি দিতে হবেক, পুজো করতে হবেক, জড়িবুটি দিতে হবেক। টাকা আর মোরগ নিয়ে চলে আসিস্।'

গুণিনের কথা মত সব কিছু নিয়ে আবার যায়। গুণিন ভরসা দিয়ে বলে—'তোর ছেলে হবেক, কুছুদিন সবুর কর।'

আশায় আশায় দিন কাটে সুনীতা ও ঝুমরুর। গুণিনের কথা শুনে সুনীতার মনেও একটু আনন্দের ছোঁয়া লাগে। সুনীতা পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে গুলিকে বাড়িতে ডাকে, খাবার দেয়। শহরে কাজ করে ফেরার সময় ছেলে-মেয়েদের জন্য বিস্কুট, লজেন্স, চানাচুর নিয়ে আসে। ওদের খাইয়ে তৃপ্তি পায় সুনীতা। ছেলে-মেয়েগুলিও সুনীতার খুব ন্যাওটা হয়ে উঠে।

এমনি করে আরও একবছর কেটে যায়। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার গুণিনের কাছে গেল। গুণিন প্রতিবারেই আশা দেয় আর মোটা টাকা আদায় করে তাদের কাছ থেকে। পাড়ার বৌ-ঝিয়েরা আড়ালে নানা কথা বলে।

তাদের ধারণা সুনীতা একজন বাঁজা মেয়ে, তার ছেলে-পুলে কোনদিনই হবে না। সুনীতা শোনে, কষ্ট পায়, গুণিনের কথায় আস্থা রাখার চেষ্টা করে। একমাত্র ছোট ছেলে-মেয়ে ছাড়া কারো সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করে না। দারুণ এক মানসিক চাপের মধ্যে তার দিন কাটতে থাকে।

এমনি করেই দিন কেটে যায়। সুনীতার মানসিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে দিনদিন। কিন্তু ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য তার ভালবাসার কোন ঘাটতি হয় না। তার বিশ্বাস ছোট ছেলে-মেয়েদের ভালবাসলে শিং বোঙা তাকে নিশ্চয়ই একটি সন্তান দেবে। তাই আরও বেশি করে তাদেরকে আপন করে নিতে চায়। আর এ কাজটা সে সত্যিই আন্তরিকভাবেই করত। ছোট ছেলে-মেয়েরা বড় হয়, তাদের জায়গায় আরও একদল আসে। এমনিভাবেই চলতে থাকে।

তাদের বাড়ির পাশেই থাকে ঝুমবুর সম্পর্কে এক ভাই। তার মেয়ে পুতলি। এই পুতলিই এখন সুনীতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। মাত্র এক-দেড় বছর বয়স, তবুও সে মাকে ছেড়ে বেশিরভাগ সময় সুনীতার কাছেই কাটায়। সুনীতা তাকে আপন সন্তান স্নেহে আদর-যত্ন করে। কিন্তু সুনীতার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় এতে ভরে না, সন্তান কামনার তীব্র বাসনা তাকে প্রতিনিয়ত কুরেকুরে খায়। অশান্তিতে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই সে ভেঙে পড়ে। পাড়াপড়শিদের ঠাট্টা ও টিটকারি তাকে আরও বেশি অশান্ত করে তোলে। বাড়িতে থাকলে সে বাইরে আসতেই চায় না। নিজেকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

দেখতে দেখতে তাদের বিয়ের প্রায় ১৩/১৪ বৎসর পার হয়ে যায়। তাদের যে কোন সন্তান হবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যায়। সুনীতা এই মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে না। আস্তে আস্তে তার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দেয়। তার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। কারণ অকারণে চিৎকার করে, গালি দেয়, এমনকি ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখলে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়। পাড়াপড়শীরা ভাবে সুনীতাকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে।

২.

কাহিনির শেষ অংশটি যেমন করুণ তেমনি হৃদয়বিদারক। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অশিক্ষা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে কিভাবে মানুষকে অমানুষে পরিণত করে তার প্রতিফলন আমরা এই অংশে দেখতে পাই। এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা যতই শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বড়াই করি না কেন

সমাজের কিছু কিছু অংশে, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কুসংস্কার এখনও প্রবলভাবে বর্তমান। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, গুণিন, মন্ত্রটন্ত্র, কবজ-তাবিজ ইত্যাদির প্রভাব এখনও এত বেশি যে অনেক শিক্ষিত মানুষও তা উপেক্ষা করতে পারে না। আদিবাসী সম্প্রদায়ে গুণিনেরা প্রায় ভগবানের মত। গুণিনের বিধানই শেষ কথা, তার একটু নড়চড় হবার উপায় নাই। অসুস্থ হলে গুণিনের কাছে যায় চিকিৎসার জন্য, ওষুধ না খেয়ে খায় জলপড়া, চালপড়া, ধারণ করে কবজ-তাবিজ। আর তার ফল যা হবার তাই হয়—বিনা চিকিৎসায় মারা যায় বেশ কিছু লোক।

পুতলি নামের যে মেয়েটিকে সুনীতা খুব ভালবাসত সেই মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে শেষে নিয়ে যাওয়া হয় গুণিনের কাছে। যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন বাচ্চাটির অন্তিমকাল উপস্থিত। গুণিন তাকে জলপড়া দেয়, কবজ দেয়। দু'দিন পর পুতলি মারা যায়। তাকে গ্রামের পাশেই শ্মশানে সমাহিত করা হয়।

কয়েকদিন পর আরও একটি নবজাত শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে চিকিৎসা ও পুষ্টির অভাবে। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য গুণিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ধরনের গুণিনরা নিজেদের সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মনে করে এবং মানুষের দুর্বলতাকে কিভাবে কাজে লাগান যায় তা ভালভাবেই জানে। সব শুনে গুণিন বিধান দেয়—ঝুমরুর বউটা 'ডাইন' এবং তার বাণ মারার জন্যই শিশুটি অসুস্থ হয়েছে। গুণিন এখানেই থেমে থাকে না। আরও বলে যে একমাত্র সুনীতাই পারে এই শিশুটিকে সুস্থ করতে। এমনকি দশদিন আগে মৃত পুতলিকেও সে বাঁচাতে পারে যদি সুনীতা তাকে তার স্তনপান করায়।

খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। এক পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠে গ্রামের লোক, কারণ ডাইনের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। এখানে কোন প্রকার দয়া-মায়া, সহানুভূতির প্রশ্ন নয়, গুণিনের কথাই বেদবাক্য। খবরটা আশে-পাশের আদিবাসী পল্লীগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন হইহই করে ছুটে আসে।

গভীর রাতে সুনীতাকে ঘর থেকে টেনে বার করে চলতে থাকে সমবেত জনতার আক্রমণ। লাঠির ঘা, ইটপাথর বর্ষণ চলতে থাকে একনাগাড়ে। রক্তাক্ত হয়ে উঠে সুনীতার সারা দেহ। জোড়হাত করে সে বলে—আমি ডাইন নই, আমাকে তোমরা মেরো না, আমি কুছু জানি না। আমি পুতলিকে খুব ভালবাসতাম।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। চলতে থাকে তার উপর অকথ্য নির্যাতন। সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে সুনীতা তাদের কথামত গ্রামের বাইরে যায় যেখানে দশদিন আগে পুতলিকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সুনীতা রক্তাক্ত অবস্থায় সেই কবর খুঁড়ে পুতলির পচাগলা মৃতদেহটা কোলে নিয়ে স্তনপান করানোর চেষ্টা করে যায় আর তার সঙ্গে গুণিনের দেওয়া মন্ত্রপূত জল ছিটাতে থাকে।

হাজার লোকের জনতা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। কিন্তু সুনীতা আর পারে না। রাত থেকে সারাদিন চড়া রোদের মধ্যে সে মৃত পুতলিকে স্তনপান করানোর চেষ্টা করে যায়। এক ফোঁটা জলও সে চেয়ে পায়নি কারও কাছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। পরে মৃতদেহটি কোলে নিয়ে কোনমতে টলতে টলতে উঠে আসে কবর থেকে। হইহই করে উঠে সমবেত জনতা। সুনীতা কোনমতে কয়েকটি কথা বলতে পারে—'আমি পুতলীকে ভালবাসি, তাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছি'—আর বলতে পারে া। পুতলির মৃতদেহটা আঁকড়ে ধরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ঝুমরু জোড় হাত করে সুনীতার জীবন ভিক্ষা করে সমবেত আক্রমণকারীদের কাছে।

শুরু হয় আরেক দফা ইট-পাথর বর্ষণ, আদিম হিংস্রতায় মেতে ওঠে সমবেত জনতা। পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। রক্তাক্ত হয়ে যায় সুনীতার সারা শরীর। সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারায় সুনীতা। এতেও জনরোষ কমে না, কারণ তাদের কাছে ডাইনের একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু। কোন রকম দয়া দেখান বা ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না।

সুনীতার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তাকে মৃত ভেবে সমবেত জনতা আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে যায়। ঝুমরু কোনমতে সুনীতার দেহটা তুলে একটি রিকশায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখনও সুনীতার দেহে প্রাণ ছিল তবে জ্ঞান সে অনেক আগেই হারিয়েছিল।

ডাক্তারদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, সুনীতা মারা যায়।

সুনীতার মৃতদেহটা এখন মর্গে রাখা আছে। তার ভাই এবং আরও কয়েকজন এসেছে সৎকারের জন্য। ঝুমরু জানত তার গ্রামের কোন লোকই আসবে না একজন ডাইনের মৃতদেহ সৎকার করতে।

মৃতদেহের সৎকার হয় সুনীতার বাপের গ্রামে। ঝুমরুও সঙ্গে যায়। তবে এরপর ঝুমরু আর গ্রামে ফেরে নাই আর সে এখন কোথায় আছে তা কেউ বলতে পারে না।

২০ রাঙা পিসি

রাঙা পিসির যে গল্পটা আজ শোনাতে চলেছি তা আজ থেকে প্রায় ৪৫/৫০ বৎসর আগেকার। তখন আমি নিতান্তই ছোট, স্কুলের ছাত্র। তখন থেকেই আমি রাঙা পিসিকে দেখেছি। কিন্তু তখনকার দেখা আর আজকের মূল্যায়ন তার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তখন রাঙা পিসির ব্যতিক্রমী চরিত্রের কথা কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু আজ বুঝতে পারি যে সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার চারিত্রিক ও মানসিক দৃঢ়তা কতটা ব্যতিক্রমী ছিল। আজ থেকে এক-দেড়শ বছর আগে যে সব মনীষী ও সমাজ সংস্কারকেরা সমাজকে কুসংস্কারহীন ও কলুষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন রাঙাপিসি তাদের সমকক্ষ কোনমতেই ছিলেন না। কিন্তু কদমপুরের মত এক অজ পাড়াগাঁয়ে থেকে নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে সামান্য প্রতিবাদ করতে পেরেছিলেন, আমার ব্যক্তিগত মতে তা ছিল অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

গ্রামের বয়স্কদের কাছে তিনি ছিলেন রাঙাদিদি, এই নামেই সবাই ডাকত, অন্য সম্পর্ক যাই থাক না কেন, আর ছোটদের কাছে রাঙাপিসি। আমাদের ভালভাবে জ্ঞান হবার পর থেকেই যখন তাকে দেখি তখন তাঁর বয়স ৬০/৬৫ বৎসর। একটু স্থূলকায়া, ধবধবে রং, দুর্গা ঠাকুরের মত চোখ মুখের গড়ন, মাথার চুল সাদা। দেখলেই বোঝা যায় বয়সকালে উনি কতটা সুন্দরী ছিলেন। পড়নে সবসময় সাদা ধবধবে থান ধুতি, নিরাভরণ দেহ, শুধুমাত্র বাম হাতের অনামিকায় একটি সরু লোহার আংটি।

এই রাঙাপিসির জীবনটা সত্যিই খুব ট্র্যাজিক। বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে, স্বামী ছিলেন রেলের কর্মচারী এবং সেই সুবাদে স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছু জায়গা ঘোরার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমরা যখন একটু বড় হলাম, কয়েকজন মিলে রাঙাপিসিকে ঘিরে বসতাম আর শুনতাম তার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা। খুব সুন্দর ভাবে বলতে পারতেন আর আমরাও তাঁর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যেন পৌঁছে যেতাম সেই অজানা অচেনা জায়গায়। রাঙাপিসির কাছে গল্প শোনাটাই ছিল আমাদের অন্যতম আকর্ষণ। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ থাকলে রাঙাপিসি চলে আসতেন আমাদের বাড়িতে। সারা দুপুর কাটাতেন, আর শোনা যেত নানা গল্প—ভ্রমণ কাহিনি, রামায়ণ, মহাভারতের কথা। তবে এসব শোনা যেত দুপুরে পড়াশুনা করে তবেই। সেদিকে রাঙাপিসির কড়া নজর থাকত।

বিয়ের পর বেশ আনন্দেই কাটছিল রাঙাপিসির। স্বামীর বদলির চাকরি ছিল বলে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানর সুযোগ ছিল। কিন্তু বেশি সুখ বোধহয় কারো

কারো সহ্য হয় না। সামান্য কয়েকদিনের রোগ-ভোগে তার স্বামী মারা যান এবং রাঙাপিসিকে আসতে হয় তার শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে ছিল শ্বশুর, শাশুড়ি এবং এক দেওর।

শ্বশুরবাড়ির অভিজ্ঞতা খুব সুখের নয়। তাদের ধারণা এই অপয়া মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার ফলেই তাদের ছেলে মারা গেছে। তাই অসহ্য বাক্যবাণ ও নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে তার জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

রাঙাপিসির বয়স তখন সবে কুড়ি-একুশ বছর। কিন্তু তা হলে কি হবে, সে তো তখন ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। তাকে তো অনেক বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে, সমাজের বিধান পালন না করে তো উপায় নাই। করতেই হবে তা যত কষ্টকর হোক না কেন, তা না হলে যে সাতপুরুষ নরকে যাবে। সুতরাং সেই গোঁড়া এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের নতুন নতুন বিধান তাকে যে কি যন্ত্রণা দিয়েছিল সে কথা শুনতে শুনতে আমাদেরও চোখ জলে ভরে যেত।

ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবা হওয়া যে মহা অপরাধ। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি নানা তিথি পালন করতে হত পঞ্জিকার নিয়ম মেনে। বিশেষ করে একাদশীর দিনগুলি একেবারে নির্জলা। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এককোঁটা জলপান করারও অনুমতি নাই, অন্যান্য খাবার তো দূরের কথা। পিপাসায় বুক ফেটে যেত, কাঁদতে ইচ্ছা করত, তবুও মুখ বুজে সব সহ্য করতে হত। সন্ধ্যাবেলায় একটু মিছরির শরবত দিয়ে উপবাস ভঙ্গ এবং একটু-আধটু ফলমূল আর সঙ্গে ভিজান সাগু চটকে খাওয়া। বিভীষিকার মত ছিল সেইসব দিনগুলি। আর তারই মাঝে বাড়ির কাজকর্মও করতে হত।

রাঙাপিসির বাবা কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার কানে মেয়ের এই দুরবস্থার খবর পৌঁছালে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। একদিন গিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে রাঙাপিসি বাবার কাছেই থাকতেন। তার নিজের কোন ভাই-বোন ছিল না। বাবা-মা মারা যাবার পর থেকেই তিনি নিঃসঙ্গ আর এই নিঃসঙ্গতাই তাকে মানবদরদী করে তোলে। তখন থেকেই গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার মেলামেশা বাড়তে থাকে। তার ব্যবহারের জন্য গ্রামের সবাই তাকে আপন করে নিয়েছিল। সব বাড়িতেই ছিল তার অবারিত দ্বার।

বিয়ের আগে গ্রামের স্কুলের পাঠটুকু সমাপ্ত করেছিলেন, তারপর স্কুলে পড়াশুনা করেননি। কিন্তু তার পড়াশুনার চর্চা থেমে থাকেনি। বাড়িতে নানা রকমের পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ, আরও বিভিন্ন ধরনের বই ছিল, সেগুলি নিয়মিত পড়তেন তার নিজের অধ্যবসায়ের ফলে অনেক কিছু শিখেছিলেন।

যে গ্রামে তিনি থাকতেন তা ছিল খুবই পিছিয়ে পড়া একটি গণ্ডগ্রাম। বয়স্কা মহিলাদের বেশির ভাগই নিরক্ষর। তাই রাঙাপিসি যখন দুপুর বা সন্ধ্যাবেলায়

তাদের কাছে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন এবং নানা ধরনের গল্প করতেন, তারা খুব খুশি হতেন।

খুব সাদা-সিধে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন, আর বিলাসিতার সুযোগই বা কোথায় ছিল। সামান্য যেটুকু আয় হত কয়েক বিঘা জমির ধান থেকে তা দিয়েই চালাতে হত সব খরচ। কোনদিন কারও কাছে হাত পাততে দেখিনি।

সকাল থেকে একটু ব্যস্ত থাকতেন, ঘরদোর পরিষ্কার করা, স্নান সেরে পূজা করা তারপর এক পাকে একটু সেদ্ধভাত। দশটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম করতেন। সেই সময় বই পড়তেন। তারপর দুপুর হলে বেড়িয়ে পড়তেন কারো না কারো বাড়িতে। এই অসময়ে আসার জন্য অবশ্য কেউ বিরক্ত হত না, বরং খুশিই হত। কারণ তাকে নিয়ে কোন ঝামেলা ছিল না। বাড়ির বউ, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প, হাসিঠাট্টা হত। কাজের ফাঁকে সবাই একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। আর অন্য যে বিষয়টি সবাইকে আকৃষ্ট করত তা হল গোটা গ্রামের খবরাখবর। বিকালবেলায় বেরিয়ে পড়তেন গ্রাম পরিক্রমায়। কার ছেলের অসুখ করেছে, কার স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে সব খবর জোগাড় করতেন আর সবাই তার কাছ থেকে জানতে পারত। আর এই জন্য কেউ কেউ আড়ালে তাকে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' বা 'কদমপুর গেজেট' বলে ঠাট্টা করত।

বিকালবেলায় দু-একজন বৌ-ঝির সঙ্গে পুকুরে যেতেন। বৌ-ঝিদের কাছে সেই সময়টুকু ছিল খুব আনন্দের। হাসিঠাট্টা, গল্পগুজবে অনেকটা সময় কাটত, সন্ধ্যার আগে পুকুরে গা ধুয়ে কাপড় কেচে বাড়ি যেতেন। সন্ধ্যার পর খুব একটা বাইরে যেতেন না, তবে কারো বাড়িতে অসুস্থ কেউ থাকলে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রোগীর শিয়রে বসে সেবাযত্ন করতেন। বিপদের দিনে কাছে থেকে সাহস দিতেন, পরামর্শ দিতেন। আর তার কথাও অনেকের কাছে ছিল বেদবাক্যের মত।

রাঙাপিসির বিপদের সময় কাছে থাকা মানেই ছিল সব মুশকিল আসান। তার ভালবাসায় ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ ছিল না, সবাই তার কাছে সমান ছিল। আর সেই কারণে রাঙাপিসির একটু-আধটু শরীর খারাপ হলে বা কোন অসুবিধায় পড়লে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা হাজির থাকত তার কাছে, তিনিও সবাইকে পেয়ে খুব খুশি হতেন।

এই গ্রামেরই একটি মেয়ে ঝর্ণা, রাঙাপিসির খুব ন্যাওটা। গরিব ব্রাহ্মণের একমাত্র মেয়ে। বাবা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য পূজারী ব্রাহ্মণ, যজমানিই ছিল একমাত্র জীবিকা। এই ঝর্ণার উপর তার টানটা যেন একটু বেশিই ছিল। নিঃসন্তান বিধবার জীবনে ঝর্ণাই ছিল মরুদ্যানের মত। নিজের মেয়ের মত তাকে ভালবাসতেন। প্রতিদিন একবার করে তার বাড়িতে গিয়ে ঝর্ণাকে দেখে আসা চাই-ই।

গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ে ঝর্ণা, তাই মেয়ে একটু বড় হতেই দীনবন্ধু তার বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ঝর্ণার বয়সই বা তখন কত বড় জোর চৌদ্দ-

পনের। বিয়ের কথা শুনে রাঙাপিসি প্রথমেই প্রতিবাদ করেন। দীনবন্ধুকে বলেন, 'দীনু, তুমি এ কি করছ? ঐটুকু মেয়ে, তার কি এখন বিয়ের বয়স? মেয়ে একটু বড় হোক, তার শরীর পূর্ণতা পাক, আরও লেখাপড়া শিখুক তবেই না তার বিয়ে দেবে। এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে?'

দীনবন্ধু সবিনয়ে বলে—'মেয়ে তো পনেরোয় পা দিল, আবার কবে বিয়ে দেব, সময়মতো বিয়ে দিতে না পারল যে ধর্মে পতিত হব।'

গর্জে ওঠেন রাঙাপিসি—'ধর্মে পতিত হবে, ধর্মের কি বোঝ তোমরা? শুধু একা নাবালিকার জোর করে বিয়ে দিলেই তোমার ধর্মরক্ষা হবে? মেয়েটার কথা একবারও ভাববে না?'

রাঙাপিসির প্রতিবাদে কোন ফল হয়নি। বেশ বয়স্ক অসুস্থ এক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে দীনবন্ধু কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতে চাইল। রাঙাপিসি ঝর্ণার এই সর্বনাশে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সর্বনাশই তো, ঐটুকু একরত্তি মেয়ে তার কিনা বিয়ে হচ্ছে পঞ্চাশোর্ধ এক অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে। রাঙাপিসি আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই বিয়ে আটকাতে পারেননি। দীর্ঘদিন তিনি দীনবন্ধুর বাড়িতে যাননি, অন্য কারো বাড়িতেও যাননি, সব সময় বাড়িতেই থাকতেন, কাঁদতেন, ঝর্ণার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শিউরে উঠতেন।

এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও একদিন ঐ পাত্রের সঙ্গেই ঝর্ণার বিয়ে হয়ে গেল। রাঙাপিসি ভাবলেন, 'বাবা হয়ে দীনবন্ধু মেয়েটার সর্বনাশ করল।'

ঝর্ণার বিয়ের পর রাঙাপিসি কিছুদিন মনমরা হয়ে থাকল। তার দরাজ গলার হা-হা হাসি শোনা যেত না। আর দীনবন্ধুর বাড়ি তো কোনদিনও যেতেন না। আস্তে আস্তে মনের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল, রাঙাপিসিকে আবার তার স্বাভাবিকরূপে দেখে সবাই আশ্বস্ত হল।

রাঙাপিসির স্বভাবটাই এমন ছিল যে, বেশিক্ষণ চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। সব সময় তাকে দেখা যেত কারো না কারো বাড়িতে। তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী ছিল গ্রামের নববিবাহিতা বধূরা। গ্রামের ছেলেমেয়ের বিয়ে হলে তার আনন্দ আর ধরত না। নতুন বৌ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি এলে একটু মনমরা হয়ে থাকত, মন খারাপ করত। কিন্তু রাঙাপিসি থাকতে কেউ মনে কষ্ট পাবে তা তো হতে পারে না। রাঙাপিসি হাজির হতেন নববধূর কাছে, তার সঙ্গে হাসি, গল্প, রঙ্গ, রসিকতায় মনের ভার অনেকটা লাঘব করে দিতেন। এমনি ছিল তার দরদী মন। আবার গ্রামের কোন মেয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে তার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত গল্প করে সব খবর নিতেন। হাসতেন প্রাণ খুলে, আনন্দ করতেন, কথায় কথায় শোলোক কাটতেন।

কিছুদিন পর এল সেই চরম দুঃখের দিন। যেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ঝর্ণা তার শাঁখা সিঁদুর বিসর্জন দিয়ে ফিরে এল তার বাপের বাড়িতে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সেদিন আর ঠিক থাকতে পারেননি রাঙাপিসি। সব মান অভিমান

ভুলে ছুটে গিয়েছিলেন দীনবন্ধুর বাড়িতে। ঝর্ণাকে বুকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সারাটা বিকাল ঝর্ণার মাথাটা বুকে ধরে দু'জনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। আর দুটি হৃদয়ের মধ্যে পরস্পরের ব্যথা বেদনা অব্যক্ত ভাষায় সঞ্চালিত হতে থাকে। শেষে আর থাকতে না পেরে ঝর্ণার বাবাকে বললেন—দীনবন্ধু, এ তুমি কি করলে। তোমাকে আমি আগেই নিষেধ করেছিলাম একজন অসুস্থ প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে।

দীনবন্ধু কান্না ভেজা গলায় স্বীকার করে, আমি ভুল করেছিলাম রাঙাদিদি, তোমার কথা না শুনে। এখন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

ঝর্ণা এখন যেহেতু কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা অনেক কিছু বিধি নিষেধ এবং আচার-আচরণ তাকে মেনে চলতেই হবে। দীনবন্ধু অত্যন্ত গোঁড়া এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। সুতরাং ধর্মরক্ষার জন্য মেয়ের কি কি করণীয় তা বুঝিয়ে দিতে ভোলেন না। শুরু হল নির্জলা একাদশী থেকে নানা ধরনের আচার পালন।

কথাটা রাঙাপিসির কানে যেতেই তিনি হাজির হন দীনবন্ধুর বাড়িতে ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য।

'দীনবন্ধু, তুমি ঝর্ণাকে নির্জলা একাদশী করার জন্য বলেছ?'

'হ্যাঁ দিদি তা বলেছি। যতই হোক ব্রাহ্মণের বিধবা, এগুলি তো মেনে চলতেই হবে, না হলে যে ধর্মে পতিত হতে হবে।'

কথাটা শুনে রাঙাপিসি আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। চরম উত্তেজিত হয়ে দীনবন্ধুকে বলেন—'আর ধর্মের দোহাই দিও না দীনবন্ধু। একবার তো ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে মেয়েটির চরম সর্বনাশ করলে, আবার ধর্মের দোহাই দিয়ে তার উপর নির্যাতন শুরু করলে?'

কি আর করব বলুন, শাস্ত্রের বিধান তো মেনে চলতেই হবে, তা না হলে যে সাতপুরুষ নরকে যাবে।'

'শাস্ত্রের বিধান দেখিও না আমাকে। আমিও কুলীন পণ্ডিত ঘরের মেয়ে। শাস্ত্রে কি আছে না আছে তা আমিও একটু-আধটু জানি। মনটাকে একটু উদার কর, দীনবন্ধু। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা কর। শুধু শুধু অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে আর পিছনের দিকে হেঁটো না, একটু এগিয়ে চল।'

'কিন্তু যাই বলুন দিদি, শাস্ত্রের কথা তো না মেনে উপায় নাই।'

'এত শাস্ত্রই যদি মান, তা হলে মেয়েকে তার স্বামীর সঙ্গে চিতায় তুলে দিলে না কেন, তাতে আরও বেশি পুণ্য সঞ্চয় হত। স্বর্গবাস একেবারে পাকা হয়ে যেত।'

এতগুলি কথা বলে রাগে ফুঁসতে থাকেন রাঙাপিসি। এতটা রেগে যেতে তাঁকে কেউ কোনদিন দেখেনি। আবার বলতে শুরু করেন—'একদিন সহমরণওতো শাস্ত্রের বিধান বলে অনেকেই মানত। সেটা কি এখন আর আছে? কেন বন্ধ হল সতীদাহ প্রথা? এ তোমাদের মত কতকগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন পণ্ডিতেরাই এটা চালু

করেছিল। সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছে বলে কি এখন ব্রাহ্মণের বিধবারা সব নরকে যাচ্ছে?'

দীনবন্ধু আমতা আমতা করে বলে—না, ঠিক তা নয়, তবে—

তার কথা শেষ না হতেই গর্জে উঠলেন রাঙাপিসি—'তা হলে আর শাস্ত্রের দোহাই দিও না; ঐ কচি মেয়েটাকে একটু শান্তিতে বাঁচতে দাও। আমি নিজে ভুক্তভোগী। নির্জলা একাদশী আর নানা তিথি পালন করা যে ঐটুকু মেয়ের পক্ষে কতটা কষ্টের তা আমি জানি।'

'তবুও ঐটুকু কষ্ট তো মেনে নিতেই হবে, তা না হলে লোকেই বা কি বলবে। আমাকে তো সমাজ নিয়ে থাকতে হবে'—দীনবন্ধু একটু নরম গলায় জবাব দেয়।

'সমাজ, সমাজ, সমাজ, নিকুচি করেছে তোমার সমাজের। যে সমাজ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার কোন মূল্য দেয় না, সে সমাজ উচ্ছন্নে যাক। আর এতই যদি সমাজের উপর দরদ, তবে মরার আগে বলে যেও, তোমার বউ যত খুশি নির্জলা একাদশী পালন করে যেন।'

সবাই বুঝতে পারে যে রাঙাপিসির ধৈর্য্যের বাঁধ ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে। দীনবন্ধু আর কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

'একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি দীনবন্ধু। মেয়ে একাদশী করে করুক, তবে নির্জলা একাদশী নয়। ভাত মুড়ি খাবে না, কিন্তু সারাদিন তাকে ফল-মিষ্টি-দুধ-ছানা খেতে দিতে হবে। আর তা যদি না করতে দাও তাহলে আমি অনর্থ ঘটাব। হতে পারে ঝর্ণা তোমার মেয়ে। কিন্তু আমিও তাকে কম ভালবাসি না। কি রকম বাবা-মা তোমরা, ঐটুকু মেয়েকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাও। তোমরা যদি না পার, তাহলে একাদশীর দিন ঝর্ণা আমার কাছে থাকবে। আমি সাধ্যমত তাকে ফল-মূল-দুধ-ছানা জোগাড় করে খাওয়াব, তোমরা এতে বাধা দিও না।'

দীনবন্ধুর পিতৃহৃদয় রাঙাপিসির কথা ও যুক্তিতে একটু নরম হয়। হাজার হোক নিজের মেয়ে তো। দীনবন্ধু মেনে নিতে বাধ্য হয় রাঙাপিসির এই ব্যবস্থা। এবং সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী একাদশীর দিন ঝর্ণা রাঙাপিসির বাড়িতে সারাদিন কাটায়। রাঙাপিসি সাধ্যমত ফল, দুধ জোগাড় করে ঝর্ণার খাবার ব্যবস্থা করেন।

ঝর্ণা শ্বশুরবাড়ি হতে আসার পর থেকে একটা কথা রাঙাপিসির মনে সব সময় ঘোরাফেরা করে। তিনি কি পারেন না ঝর্ণাকে নতুন করে বাঁচার সুযোগ করে দিতে? কিন্তু ব্যাপারটা চিন্তা করলে মাঝে-মাঝে তার মনে সংশয়ও জাগে। তিনি কি পারবেন তার এই মনের গোপন ইচ্ছা রূপায়িত করতে? বসে না থেকে তিনি চিঠি লেখেন অনেকদিন আগেকার পাতান এক বান্ধবীকে। চিঠির উত্তর কয়েকদিনের মধ্যেই এসে যায় এবং তার পরিকল্পনা যে সার্থক হতে পারে তার আভাস পান। রাঙাপিসির মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। তিনি ভাবতে থাকেন পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে। একদিন সরাসরি ঝর্ণাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঝর্ণা মা, তোর কি

নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করে না? আর পাঁচটা মেয়ের মত ঘর বাঁধতে ইচ্ছা করে না?'

ঝর্ণা তার কথা শুনে চমকে ওঠে। কোন জবাব দেয় না, মাথা নিচু করে বসে থাকে। চিবুকে হাত দিয়ে মাথাটা তুলে রাঙাপিসি দেখতে পান ঝর্ণার দু'চোখ জলে টলটল করছে। রাঙাপিসির বুঝতে আর বাকি থাকে না। ঝর্ণার দিক থেকে যে কোন আপত্তি নেই তা বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হন।

আরেক প্রস্থ শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক এবং ঠাণ্ডা লড়াই দীনবন্ধুর সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত রাঙাপিসির যুক্তির জালের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় তাকে। তবে ঝর্ণার আবার বিয়ে দেবার জন্য তাকে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রসম্মত সব প্রমাণই দিতে হয়েছিল আর এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত পথই ছিল তার একমাত্র সহায়।

রাঙাপিসি স্বল্প যেটুকু সময় স্বামীর ঘর করার সুযোগ পেয়েছিলেন তখনই সই পাতান কমলার সঙ্গে এবং পরে জানতে পারেন যে কমলার ছেলের পত্নীবিয়োগ হয়েছে। তিনি কমলার ছেলের সঙ্গে ঝর্ণার বিবাহের প্রস্তাব দেন যা কমলা আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেন এবং ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হন।

একদিন শুভলগ্নে খুব অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কমলার ছেলের সঙ্গে ঝর্ণার বিয়ে হয়। ঝর্ণা চোখের জল মুছে স্বামীর সঙ্গে গমন করল, রাঙাপিসির স্বপ্ন সার্থক হল, দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এই ঘটনায় গ্রামের মানুষ রাঙাপিসির উপর আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। সবাই ধন্য ধন্য করতে থাকে রাঙাপিসির এই হিম্মত দেখে। হিম্মতই তো, কারণএর আগে বিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতেও কেউ সাহস পেত না, শিক্ষার আলোকবর্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই গণ্ডগ্রামের লোকেরা।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। রাঙাপিসির বয়সও বেড়েছে, বেড়েছে তার রোগভোগের পরিমাণও।

একদিন এল শেষের সেদিন। রাঙাপিসি তখন মৃত্যুশয্যায়। গ্রামের লোক পালা করে তার সেবাযত্ন করে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বারবার ঝর্ণার নাম করতে থাকেন। খবর পেয়ে ঝর্ণা তার স্বামী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে এসে হাজির হয়। ঝর্ণা এখন একজন সুখী গৃহিণী।

রাঙাপিসিকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝর্ণা। তখন রাঙাপিসিরও অন্তিম সময় উপস্থিত। ঝর্ণাকে দেখে ঠোঁটের কোণে মৃদু এক হাসির ঝিলিক দেখা গেল, কিছু বলার চেষ্টা করেও পারলেন না, চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ডান হাতটা একটু তুলতেই ঝর্ণার কোলের উপর হাতটা পড়ে গেল। ঝর্ণা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।